[১] যে কেসের কিনারা হয়নি

আমি বললাম–"অসম্ভব। যে খুনীকে আট বছর আগে ধরা যায়নি–তাকে আর ধরা যাবে না।"

ইন্দ্রনাথ বললে–"এই পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।"

আমি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললাম–"ওটা তোমার লেখা ডিকশনারির বুলি।"

"বুলি নয়, মৃগাঙ্ক," আমার চোখে চোখ রেখে বললে ইন্দ্রনাথ–"আমার মনোবল। সিদ্ধি সহজে আসে না। প্রব্লেমকে নানা দিক থেকে অ্যাটাক করতে হয়। প্রব্লেম থাকলে তার সলিউশন থাকবেই। যে প্রব্লেমের সমাধান নেই, *সেটা প্রব্লেমই নয়।*"

"ফাইল অফিসিয়ালি ক্লোজড হয়ে গেছে।"

"যাক। যদিও তা করা উচিত নয়। বহু দিন যেতে পারে, বহু মাস যেতে পারে, বহু বছর যেতে পারে। ফ্রেশ এভিডেন্স হাতে আসতে পারে।"

বিতর্কে অংশ নেয়নি জয়ন্ত। পুলিস বিভাগে ও এখন একটা বিশেষ জায়গায় পৌঁছেছে। গোটা দেশে খুন খারাপি বেড়েছে। বিশেষ 'সেল' তৈরি হয়েছে। ও তার চার্জে আছে। পৃথিবী জুড়ে নানারকম ক্রাইম হয়ে চলেছে। এখন শুরু হয়েছে সাইবার ক্রাইম। কিন্তু মার্ডার আজও সব চাইতে সিরিয়াস ক্রাইম। মার্ডার মিস্ট্রি সলভ করতে গেলে দরকার অভিজ্ঞতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, জেদ আর জেরা করার কৌশল। জয়ন্ত এই গুণগুলোর অধিকারী। তাই ওর বিশেষ ক্ষমতার জোরে যেখানে খুশি যেতে পারে, 'মার্ডার অফিস' খুলে বসতে পারে, স্থানীয় পুলিসকে সাহায্য করতে পারে। এতে কাজ হচ্ছে। যদিও প্রেস রিপোর্টে জয়ন্তর নাম কোথাও থাকছে না। সিক্রেট 'সেল'-এর খবর কেউ জানে না। আরও একটা নাম পাবলিকের অগোচরে রাখা হয়েছে। ইন্দ্রনাথের নাম।

বহু কেসে ইন্দ্রনাথ ওর পাশে থাকে। হত্যাকারীকে চাই। প্রাইভেট ডিটেকটিভ যদি তার বুদ্ধি ধার দেয়, ক্ষতি কী? এতে ওপরওলাদের সায় আছে। মদত আছে। কারণ, কাজ হচ্ছে।

জয়ন্ত এসেছিল এই মতলবেই। সেদিন ছিল রবিবার। বালিগঞ্জ থেকে বেলেঘাটায় গেছিলাম ইন্দ্রনাথের সঙ্গে আড্ডা মারতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এল জয়ন্ত। বলল ওর মিস্টিরিয়াস কেস-কাহিনী। ব্যাপারটা এই:

[২] গ্রিনটাউন শহরের রহস্য

'গ্রিনটাউন' একটা ছোট শহর। আয়তনে ছোট হলেও বড় শহরের খুদে সংস্করণ। পুলিস ফাঁড়ি নতুন বাড়িতে গেছে। দারোগা অভয়ঙ্কর তলাপাত্র জয়ন্তকে নতুন অফিস দেখাচ্ছে। কারণ, এটা এখন 'মার্ডার অফিস'ও বটে। সে প্রসঙ্গ এখনও তোলেনি অভয়ঙ্কর তলাপাত্র। বয়স চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। গাত্রবর্ণ অমানিশা প্রতিম। চক্ষু যুগল সদা রক্তবর্ণ। গোঁফ মিলিটারি ধাঁচের। মাথায় পাক্কা ছ'ফুট। মেদহীন। প্রকৃত ব্যায়ামবীর।

প্রথম আলাপেই জয়ন্ত বলেছিল–"যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা প্রস্তাব রাখব।"

শশব্যস্ত হয়ে অভয়ঙ্কর তলাপাত্র বলেছিল–"একটা কেন, স্যার, একশটা রাখুন।"

"আপাতত একটা। আপনার নামটা বড্ড বড়।"

"আজ্ঞে, বাবার দেওয়া নাম।"

"আমি যদি একটু ছোট করে নিই, আপত্তি করবেন?"

"একদম না। এটা তো 'মিনি'র যুগ।"

"নামটার মুড়ো আর ল্যাজ কাটব।"

"স্বচ্ছন্দে। তাহলে কি দাঁড়াল?"

"ভয়ঙ্কর পাত্র।"

এই কাহিনীতে এখন থেকে তাকে শুধু ভয়ঙ্কর পাত্র বলা হবে।

ভয়ঙ্কর পাত্র বললে–"স্যার, আর তেমন ঘর তো নেই। তাই একটা ঘরেই দুজনের অফিস করলাম।"

"উত্তম কাজ করেছেন। ফার্নিচারগুলো সেইভাবেই সাজিয়েছেন দেখছি।"

"যাতে দুজনেরই কাজের সুবিধে হয়।"

"এলাহি কাণ্ড করেছেন মিস্টার ভয়ঙ্কর পাত্র।"

"স্যার, আপনিই করিয়ে দিলেন।"

"যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে যে।–ওটা কী করছেন?"

ভয়ঙ্কর পাত্র একটা কালো রঙের তোবড়ান টিনের ট্রাঙ্ক হাতড়াচ্ছিল। বদখত বস্তুটা এ ঘরে মানাচ্ছে না। এখানে সব কিছু মডার্ন–ওই ট্রাঙ্কটা ছাড়া। পুলিসের ট্রাঙ্ক, নথিপত্র রাখা হত। তালা-দেওয়া থাকত।

"খুঁজছি", বলতে বলতে ট্রাঙ্কের একদম তলা থেকে এক বান্ডিল ফাইল বের করল ভয়ঙ্কর পাত্র। কোণের টেবিলে রাখল, ফাইল তো নয়, চিত্রগুপ্তের জাবদা খাতা। বেশি খুঁজতে অবশ্য হল না। ওপরেই রাখা ছিল বিশেষ সেই ফাইল। তুলে নিয়ে রাখল জয়ন্তর টেবিলে।

জয়ন্ত বললে—"এর মধ্যে কী আছে?"

ভয়ঙ্কর পাত্র বললে—"আনফিনিশড বিজনেস।"

"অর্থাৎ?"

"সহসা মৃত্যু। জগৎপুরে। আট বছর আগে। তখন আমি গ্রিনটাউনে। বদলি হয়েছিলাম। আবার এসেছি।"

"রহস্যটা কোথায়? কেস অসমাপ্ত কেন?"

"কে খুন করেছে জানা যায়নি, কিভাবে করেছে জানা যায়নি, কেন করেছে তাও জানা যায়নি।"

"ফানি বিজনেস।"

"ইয়েস, স্যার।"

ফাইল নিয়ে বসল জয়ন্ত।

'গ্রিনটাউন' শহরের অতীত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে পাতায় পাতায়। খুদে খুদে হরফে, কিন্তু সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে তদন্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা হয়েছে। 'গ্রিনটাউন' তখন মাথা চাড়া দিচ্ছে। পুলিসের হাতে সময় ছিল যথেষ্ট। তাই এমন হরফ-চিত্র রচনার সময় পাওয়া গেছিল। জয়ন্তর চোখ চলল ঝটিকাবেগে। পড়ছে আর ভাবছে, আগের 'গ্রিনটাউন' আর এখনকার 'গ্রিনটাউন'-এ কতই না তফাত। সময় সব কিছু পালটে দিয়ে যায়।

ফেলে আসা গজকচ্ছপের যুগ পেরিয়ে আসতে হয়েছে জয়ন্তকেও। তখন এত মোটর গাড়ির চোখ ধাঁধানো ছুটোছুটি ছিল না। পবনবেগে ধেয়ে যাওয়ার উপযুক্ত এত মোটর রাস্তাও ছিল না। এত ভ্রমণবিলাসী ছিল না। পথের পাশে এত সুরার দোকান ছিল না। মধুমক্ষিকারা এত সুলভ আর সহজলভ্য ছিল না। নামগোত্রহীন যে কোনও খুনী এখন কয়েক পেগ খাইয়ে মনের মতো নারীকে, সেই নারীরই ইচ্ছায়, গাড়িতে চাপিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে। তারপর লাশ ফেলে দিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। সন্দেহভাজনদের লিস্ট আছে বটে পুলিসের কাছে। লম্বা লিস্ট। কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার সাসপেক্টের নাম। তাদের মধ্যে থেকে কুলোঝাড়া দিয়ে আসল খুনীকে বের করা আর খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা একই ব্যাপার।

কুন্তলা শীল মেয়েটার ক্ষেত্রে প্রায় তাই ঘটেছে। সে খুন হয়েছে। কারা তাকে খুন করতে পারে, পুলিসের তা জানা আছে। কুন্তলাকে দেখতে ভাল, রোজগার করত ভাল, এমন কি শখ করে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ফিয়াট গাড়িও কিনেছিল। নিজে ড্রাইভ করত। এ যুগের হাওয়ায় মানুষ। স্বনির্ভর হতে চেয়েছিল। হয়েছিল। মাত্র চব্বিশ বছর বয়েসে। ঢিলেঢালা শাড়ি ছিল তার দু'-চক্ষের বিষ। পার্সোন্যাল সেক্রেটারি হতে গেলে চেহারায় যতখানি চেকনাই প্রয়োজন, সবই তার ছিল। বয়কাট চুল, গলায় পেঁচানো স্কার্ফ। গ্রীবা বেঁকিয়ে কথা বলা। ঝকমকে অপাঙ্গ চাহনি। অনাড়ষ্ট মেলামেশা। প্রয়োজনে মদিরা সেবন করা। তারপর উদ্দাম নাচে পুরুষ সঙ্গীদের নাচিয়ে দেওয়া।

এইভাবেই কেটেছিল তার জীবনের এক শেষ রবিবারের সন্ধ্যা। ডিনার পার্টি মাতিয়ে দিয়েছিল ছেলে বন্ধু আর মেয়ে বন্ধুদের নিয়ে। রাত ন'টায় বেরিয়ে গেছিল গাড়ি হাঁকিয়ে। পিতৃগৃহের সদর দরজার এক মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

পরের দিন ভোর চারটের সময়ে এক লরি ড্রাইভার গাড়ি পার্ক করতে গিয়েছিল নিরিবিলি একটা রাস্তায়। সে সময়ে এ রাস্তায় সন্ধের পর থেকে ভোর পর্যন্ত গাড়ি প্রায় চলত না বললেই চলে। অথচ অত ভোরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল পার্কিং-এর জায়গায়। ছোট গাড়ি। কিন্তু ঝাঁ করে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার ফলে জায়গা নিয়েছিল অনেকটা। পার্কিং-এর নিয়ম তো এরকম নয়। একপাশে গুছিয়ে গাড়ি রাখতে হয়। কিন্তু পুঁচকে এই গাড়ি সে-সব গোছগাছের ধার ধারেনি। সাঁ করে ঢুকেই যেন ঘ্যাঁচ করে ব্রেক মেরেছে। পার্কিং স্পেস-এর ঠিক মাঝখানে, বড় লরি ঢোকানোর জায়গা কোথায়?

লরি ড্রাইভারের মেজাজটা খিঁচড়ে গেছিল এই কারণেই। এমনিতেই সারা রাত ড্রাইভিং-এর ফলে মাথা গরম, শরীর ক্লান্ত। ভোরের আলো ফুটতেই প্রকৃতির আহ্বান তীব্র হয়ে উঠেছিল। তাই পার্কিং স্পেশ দেখে লরিটাকে গুছিয়ে রাখতে গেছিল। পুঁচকে গাড়ির বেখাপ্পা পার্কিং দেখে গরম চোখে সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেয়েছিল, ড্রাইভারের আসনে কে যেন বসে রয়েছে।

লরিতে বসেই গলার শির তুলে চেঁচিয়ে গেছিল ড্রাইভার। খুদে গাড়িটাকে একটু পাশ করে রাখলেই তো হয়। বড় লরিটা তাহলে একটু জায়গা পাবে।

কিন্তু খুদে গাড়ির চালক কর্ণপাত করেনি।

স্পর্ধা তো কম নয়। লাফিয়ে লরি থেকে নেমেছিল ড্রাইভার। হনহনিয়ে গেছিল লিটিল ফিয়াটের দিকে।

দূর থেকেই দেখেছিল, চালকের আসনে বসে রয়েছে একটি মেয়ে।

এত ভোরে? বয়স কম, দেখতেও ভাল। হয়তো হাওয়া খেতে বেরিয়েছে, অথবা গাড়ি চালান শিখতে বেরিয়েছে।

কিন্তু তা তো নয়। গাড়িতে 'L' প্লেট ঝুলছে না। ড্রাইভিং শেখানোর জন্যে অন্য কেউ বসেও নেই। মেয়েটা একা রয়েছে গাড়ির মধ্যে—স্টিয়ারিং-এর সামনে। এত হাঁকডাকও যখন কানে যায়নি, তখন নিশ্চয় ঘুমচ্ছে। গায়ে জড়ানো রয়েছে কিন্তু ফিনফিনে একটা রেনকোট। ফাঁকা রাস্তার জোর হাওয়া জানলা দিয়ে ঢুকে পতপত করে ওড়াচ্ছে রেনকোটের হেডক্যাপ—যা এলিয়ে রয়েছে পিঠের ওপর।

শীতে মরে যাবে যে। আশ্চর্য মেয়ে তো! জানলার কাচটা পর্যন্ত নামিয়ে রেখে অঘোরে ঘুমাচ্ছে কনকনে ঠাণ্ডায়!

উইন্ডস্ক্রিনে আঙুলের গাঁট ঠুকতে গেছিল লরি ড্রাইভার—মেয়েটার ঘুম ভাঙানোর জন্যে।

কিন্তু থমকে গেছিল।

মেয়েটার দু'চোখের পাতা পুরো খোলা রয়েছে।

লরি ড্রাইভার যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিল, পুলিসের কাছে, তা ছোট করে লেখা ছিল রিপোর্টের তলায়। জয়ন্ত তা পড়ে নিল। তারপর তুলল মেডিক্যাল রিপোর্ট-এর কপি।

হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে কুন্তলা শীল। আগের মেডিক্যাল হিসট্রিতে রয়েছে তারই আভাস। হৃদযন্ত্র ছিল কমজোরি।

হার্ট অ্যাটাক? ভুরু কুঁচকে গেছিল জয়ন্তর। তাহলে ভয়ঙ্কর পাত্র এ-কেস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন? পুরোনো ফাইল ঘাঁটার কী দরকার ছিল?

চব্বিশ বছর বয়েসে হার্ট অ্যাটাক যদিও একটা বিরল ঘটনা। কিন্তু দুর্বল হৃদযন্ত্র নিয়ে অনেকেই তো ভূমিষ্ঠ হয়। ভগবান তাদের মেরে রাখেন। কুন্তলা শীল মেয়েটাও নিয়তির ডাক শুনে পরপারে চলে গেছে। পুলিস তা নিয়ে মাথা ঘামায় না—ডাক্তাররা ঘামায়। অদ্ভুত কেস পুঁথিতে জমিয়ে রাখে। পুলিস ফাইল ক্লোজ করে দেয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে পুলিসের টনক নড়েছিল।

কারণ, কুন্তলা শীলের মাথার বাঁ দিকে দেখা গেছে একটা গভীর চোট। খুলিতে চোট। খুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার মতো বড় চোট নয়, তবে রক্ত ঝরেছিল ভালই।

মাথার বাঁ দিকে....

সেদিকে একজন প্যাসেঞ্জার বসে থাকার কথা।

ভয়ঙ্কর পাত্র বললে—"স্যার, খটকাটা এইখানেই।"

জবাব না দিয়ে জয়ন্ত অনড় চোখে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল ভয়ঙ্করের লাল চোখের দিকে। পুলিসকে নিয়ে হাসিতামাশা সবাই করে। শার্লক হোমস থেকে আরম্ভ করে এখনকার সব গোয়েন্দা লেখকরাই। ভয়ঙ্কর পাত্র একাই এদের চোখ খুলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

মুখ খুলল তারপর—"মাথার বাঁ দিকে চোট। হার্ট অ্যাটাকের আগে না পরে? আলোচনা করা যাক নিজেদের মধ্যে। ও-কে?"

"ও-কে, স্যার। প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে ঝরে যাওয়া রক্তের পরিমাণটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে।"

"কারেক্ট। সময়ের প্রশ্ন এসে যাচ্ছে এইখানেই। রক্ত ঝরেছিল হার্ট অ্যাটাকের আগে, না, পরে?"

"হার্ট অ্যাটাকের পরে যদি ঝরত, এত ঝরত না। অ্যাটাক আরম্ভ হতেই এলোপাতাড়িভাবে পার্কিং করেছে কুন্তলা শীল। সেই সময়ে মাথার বাঁ দিকে ঠোক্কর লেগেছে কোনও একটা জায়গায়।"

"গাড়ির মধ্যে মাথার বাঁ দিকে কী ছিল—রক্ত ঝরিয়ে দেওয়ার মতো?"

"ড্রাইভিং মিরর।"

"হার্ট তখন বন্ধ হয়ে গেছে। কুন্তলা শীলের ধড়ে তখন প্রাণ নেই। প্রাণটা যাওয়ার আগে ব্রেক কষেছিল। মাথা ঠুকে গেছিল। রাইট?"

"ইয়েস, স্যার। হার্টের পাম্পিং যখন বন্ধ হয়ে গেছে, এত রক্ত ঝরবে কেন?"

"বাঃ। চমৎকার ভেবেছেন। রক্তের পরিমাণটা যখন বেশি তখন সোজা যুক্তি বলছে, মাথায় চোট লেগেছিল আগে, হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল পরে। রাইট?"

"আই স্যার।"

"ইয়াঙ্কি ঢঙে কথা বলবেন না। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই: মার্ডার করা হয়েছিল কুন্তলা শীলকে....."

"মেডিক্যাল রিপোর্ট কিন্তু সাইলেন্ট থেকেছে মার্ডারের ব্যাপারে।"

চোখ নামাল জয়ন্ত, খুঁটিয়ে পড়ল মেডিক্যাল রিপোর্টের প্রতিটি শব্দ। ডাক্তাররা অনেক সময়ে জেরা এড়ানোর জন্য সাঁটে মেরে দেয়। এ কূল ও কূল দু'কূলই বজায় থাকে। বুঝ সাধু যে জানো লক্ষণ।

এই রিপোর্টেও তাই করা হয়েছে। অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'র মতো একটা বয়ান রয়েছে। বয়ানটা জয়ন্ত একবার পড়ল, দু'বার পড়ল, তিন বার পড়ল।

তারপর জিজ্ঞেস করল ভয়ঙ্কর পাত্রকে—"কুন্তলা শীল ড্রাইভিং সিটে কিভাবে বসেছিল? আরামে, না, কষ্টকর অবস্থায়? অত রিপোর্ট পড়বার সময় নেই। আপনি বলুন। গাড়ি পার্ক করবার পর তার সিটিং পজিশন কিরকম ছিল?"

"নাইস অ্যান্ড কমফর্টেবল।"

"চমৎকার, হার্ট অ্যাটাক ভগবানের অবদান—মানুষের হাত নেই। কিন্তু ভগবান এই ব্যাপারে বড় নিষ্ঠুর। মোটরিস্টকে ধীরে সুস্থে গাড়ি পার্ক করার সময় দেন না। মাঝ রাস্তা থেকে গাড়ি নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পর ড্রাইভারের হার্ট অ্যাটাক ঘটান না।"

"ইয়েস, স্যার।"

"থ্যাংকিউ। ইয়াঙ্কি বুলিটা তাহলে ছাড়তে পারলেন। নাউ, মিস্টার পাত্র, ডক্টর এইখানে," মেডিক্যাল রিপোর্টের এক জায়গায় আঙুল রাখাল জয়ন্ত—লিখেছেন, *বডি সরানো হয়েছিল মৃত্যুর কিছু পরে।"*

ভয়ঙ্কর পাত্র মিলিটারি গোঁফে তর্জনী সঞ্চালন করে বললে—"ইন্টারেস্টিং।"

"কুন্তলা শীল-এর কেস ঘোরাল হয়ে উঠছে ঠিক এই পয়েন্ট থেকেই।"

এই বলে, আরও দুটো স্টেটমেন্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল জয়ন্ত। কুন্তলা শীল-এর মা আর বাবার দেওয়া দুটো স্টেটমেন্ট। দুজনেই একই গাওনা গেয়েছেন। তাঁদের কন্যার মৃত্যু মোটেই 'ইন্টারেস্টিং' নয়, অথবা ঘোরাল নয়।

দুটো স্টেটমেন্টেই আর একটা ব্যাপার সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর কেউই 'ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার'এর মানুষ নন। সাধারণ দম্পতি। তাঁদের কন্যাও আর পাঁচটা মেয়ের মতো সাধারণ —সমাজে মিশে যাওয়ার মতো মেয়ে —সমাজ থেকে ছিটকে যাওয়ার মতো মেয়ে নয়। কুন্তলা শীল তাঁদের কাছে প্রকৃতই একটা রত্ন। বাড়িতে ঝুট ঝামেলা বাধায়নি কক্ষনও। বাড়ির বাইরেও কারও সঙ্গে লটঘট ব্যাপার ঘটায়নি। গুড গার্ল। নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারে। মানিয়ে নিতে পারে। তাই সবার চোখেই সে ভাল মেয়ে থেকেছে বরাবর। হার্ট খারাপ ওর ছেলেবেলা থেকেই, কিন্তু চালিয়ে তো যাচ্ছিল। না, ওষুধপত্র কখনও খায়নি।

রবিবার রাতের ডিনার পার্টির কথাই ধরা যাক। পার্টি দিয়েছেন খোদ বস। বড়লোক। বড় ব্যবসার মালিক। বাড়িটাও একটা প্রাসাদ। শহরের বাইরে। সেখানেও তো মুখরোচক কিছু ঘটেনি। আরও চারজন গেস্ট হাজির ছিল ডিনার পার্টিতে। বিজনেসের জুনিয়র এক্সিকিউটিভ এসেছিলেন তাঁর গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে। অন্য একটা বিজনেসের জুনিয়র এক্সিকিউটিভও এসেছিলেন তাঁর বাগদত্তাকে নিয়ে। মোট ছ'জনের পার্টি। কুন্তলা শীলকে বাদ দিলে থাকছে পাঁচজন। পাঁচজনের মধ্যে চারজনের স্টেটমেন্টই এক রকম। অঞ্জনার স্টেটমেন্ট পাওয়া যায়নি।

কুন্তলা শীল এসেছিল সাতটায়।

ডিনার খাওয়া শুরু হয়েছিল ঠিক তারপরেই।

টেবিল সাফ হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিল কুন্তলা। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ থেকে যেতে হয়েছিল বস-এর অনুরোধে। পরের দিন সকালেই তাঁকে যেতে হবে বিজনেস ট্রিপে। তাই কয়েকটা চিঠির ডিকটেশন দিয়েছিলেন কুন্তলা-কে।

তারপরেই, শর্টহ্যান্ড নোটবুক ব্যাগে রেখেছিল কুন্তলা। ব্যাগ নিয়েই এসেছিল পার্টিতে। খান কয়েক বিল পেমেন্ট করা বাবদ চার হাজার টাকা দিয়েছিলেন বস। এই টাকাও ব্যাগে রেখেছিল কুন্তলা।

বেরিয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

তখন প্রায় রাত ন'টা।

তারপর তাকে জীবিত অবস্থায় এই চারজনের কেউই আর দেখেনি।

হ্যান্ডব্যাগ রহস্য শুরু হয়েছে এইখান থেকেই।

কারণ, এই বস্তুটিকে কেউ আর দেখেনি!

হ্যান্ডব্যাগ! জয়ন্তর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল জিনিসটা। সব মেয়ের কাছেই এই একটি বস্তু বড় প্রিয়। এবং নিত্যসঙ্গী। চশমাধারী যেমন চশমা ছাড়া হলেই বুঝতে পারে, কী যেন হারিয়ে গেছে। মেয়েরাও হ্যান্ডব্যাগ কাঁধে অথবা হাতে না রাখলে নিজেদের খুবসুরত মনে করে না। হ্যান্ডব্যাগ। ওরফে, ভ্যানিটি ব্যাগ। তর্জমা করলে দাঁড়ায়, দম্ভ থলি। মেয়েদের দম্ভ। এ যুগের কোমলাঙ্গীরা তো নিষিদ্ধ বস্তু থেকে আরম্ভ করে প্রসিদ্ধ বস্তু পর্যন্ত সব কিছুরই স্থান করে নেয় এই বটুয়ার মধ্যে। বস্তুটা তাদের দ্বিতীয় হৃদয়।

কুন্তলা শীল মডার্ন গার্ল। ইয়াং। চার্মিং। স্মার্ট। ড্যাশিং পুশিং। নীতিবোধের নিগড়বদ্ধ নয়। নিত্যসঙ্গী দম্ভ-বটুয়া নিয়ে গেছিল ডিনার পার্টিতে। অবশ্যই নিজেকে ফ্রেশ আর অ্যাট্রাকটিভ রাখার জন্যে। খানাপিনা অন্তে নোটবুক আর টাকার বান্ডিল হ্যান্ডব্যাগের উদরে প্রবেশ করিয়ে পার্টিস্থল ত্যাগ করেছিল।

তারপর যখন তাকে দেখা গেল, শুধু তাকেই দেখা গেল, নিত্যসঙ্গী দম্ভ-বটুকা বুঝি পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে।

সেই সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়েছে আরও একটা বস্তু।

স্কার্ফ।

আলট্রামডার্ন ড্রেস পরে পার্টিতে গেছিল কুন্তলা শীল। হ্যান্ডব্যাগের মতোই নিত্যসঙ্গী আর একটা বস্তুকে গলায় বাহারি বন্ধনে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তার স্কার্ফ। রেশমি স্কার্ফ। বাটিকের কাজ করা। চোখ কাড়ে সবার আগে। নারী বরতনুতে পুরুষের পোশাক তার পয়লা ফ্যাশন। দোসরা ফ্যাশন এই স্কার্ফ—নেকটাইয়ের বিকল্প।

সান্ধ্য আসর থেকে যখন সে বিদায় নিচ্ছে (অবশ্যই হাস্যাধরা ললিত ভঙ্গিমায়), তখন তার চারুগ্রীবা বেষ্টন করেছিল এই স্কার্ফ।

স্কার্ফ কালেকশন তার হবি। ছেলেদের নেকটাই কালেকশনের মতো নিত্য পরিবর্তন ঘটত। চোখ ধাঁধানোর কৌশল আয়ত্ত করেছিল নিখুঁত নিষ্ঠায়।

তাই সেই বিশেষ রবিবারের বিশেষ স্কার্ফ কী ধরনের ছিল, তা জলছবির মতো ছাপ মেরে গেছে সপ্তব্যক্তির মনের পটে।

এই সাতজনের মধ্যে রয়েছেন কুন্তলার পিতা-স্বর্গ আর জননী-জন্মভূমিশ্চ; রয়েছেন অন্নদাতা-বস; রয়েছেন স-বাগদত্তা এক এক্সিকিউটিভ এবং স-বান্ধবী আর এক এক্সিকিউটিভ।

সাতজনেই দেখেছেন সেই সন্ধ্যার কণ্ঠ-আকর্ষণী বস্তুটাকে।

প্রত্যেকেরই মনে ছিল সেদিনের স্কার্ফটা ছিল কী ধরনের, কী রকম নকশার। বাটিকের কাজ করা। গাঢ় লাল আর ফিকে কালো রঙের সংমিশ্রণ শুধু বর্ডারে। বাকিটা ময়ূরকণ্ঠী বর্ণের।

এমন জিনিস একবার দেখলে চট করে ভোলা যায় না।

কুন্তলা শীলকে ডিনার পার্টির পর সজীব সহাস্য অবস্থায় আর দেখেনি এই পাঁচজন।

কিন্তু পাঁচজনেরই মনের পরতে পরতে *গেঁথে গেছিল নয়নসুন্দর স্কার্ফের* ছবি।

এই চার ব্যক্তির মধ্যে আবার শুধু তিন ব্যক্তির সুস্পষ্ট মনে আছে, রাত প্রায় নটার সময়ে যখন কুন্তলা শীল নাম্নী বিদ্যুৎবল্লরী বিদায় নিচ্ছে ভোজনকক্ষ থেকে, তখন তার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করেছিল আশ্চর্যসুন্দর সেই স্কার্ফ।

কুন্তলা অলঙ্কারপ্রীতি কক্ষনও দেখাত না। তাতে নাকি নিজেকে বড় মেয়েলি দেখায়। নারী পুরুষের অশন যখন এক, বসন এক থাকবে না কেন? গলায় তাই চন্দ্রহারের পরিবর্তে থাকত এই স্কার্ফ।

এবং, স্কার্ফ-ঝলক দেখিয়েই খানাপিনার কক্ষ থেকে বিদায় নিয়েছিল কুন্তলা। তিনজন তা দেখেছে। তিনজনেরই তা স্পষ্ট মনে আছে।

শুধু তিনজন।

পয়েন্টটা মাথার মধ্যে রাখল জয়ন্ত।

"হ্যান্ডব্যাগ আর স্কার্ফ," বললে ভয়ঙ্কর পাত্রকে– "নিখোঁজ এই দুটি জিনিস উদ্ধারের জন্যে খানাতল্লাসি কী কী হয়েছে? আরে মশায়, অত রিপোর্ট পড়া যায় নাকি? পড়ব, পরে পড়ব। আপনি চুম্বকটুকু শুনিয়ে দিন।"

গলাখাঁকারি দিয়ে ভয়ঙ্কর পাত্র বললে–"তাহলে স্যার, শুধু এই স্কেচ ম্যাপগুলো দেখুন। কোন কোন জায়গা কভার করা হয়েছে–সব দেখানো হয়েছে–"

"দেখলাম। কিন্তু স্কার্ফ আর হ্যান্ডব্যাগ পেলেন না?"

"পেলাম রাশি রাশি স্কার্ফ আর হ্যান্ডব্যাগ। শুধু ওই দুটো ছাড়া। ছেলেদের তো স্যার একটা মানিব্যাগ হলেই চলে যায়, মেয়েরা এত হ্যান্ডব্যাগ কেনে কেন?"

"গিন্নি কাকে বলে এখনও তা জানেন না। আপনার কথাই তার প্রমাণ।"

"আজ্ঞে ওই পাঠশালায় পড়িনি। গিন্নি নিয়ে পুলিসের চাকরি করা যায় না।"

কথাটা মনে ধরল জয়ন্তর। গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করেও থাকতে পারল না। ফলে, একটা উদ্ভট হাস্যরেখা জাগ্রত হল ঠোঁটের দুই প্রান্তে।

বলল–"একই তরণীর যাত্রী আমরা দুজনেই। পুলিস গিন্নিদের অবস্থা বড় করুণ হয়ে দাঁড়ায় যখন প্রমোশন পেতে থাকে পুলিস স্বামীরা। যাক এই সব ছেঁদো কথা। অনেক হ্যান্ডব্যাগ, অনেক স্কার্ফ উদ্ধার করলেন খানাতল্লাসি করে এই-এই জায়গা থেকে।" 'স্কেচ-ম্যাপের ওপর আঙুল রেখে চালিয়ে গেল জয়ন্ত–"পেলেন না শুধু সেই ময়ূরকণ্ঠী স্কার্ফ আর নিশ্চয় মানানসই হ্যান্ডব্যাগ–"

"ঠিক ধরেছেন, স্যার। হ্যান্ডব্যাগটাও ছিল ময়ূরকণ্ঠী বাটিক দিয়ে ম্যাচ করানো। টেস্ট ছিল কুন্তলা শীল মেয়েটার।

"খুবই স্বাভাবিক। যা খুঁজেছেন, তা পাননি। কেন পাননি, সে সম্পর্কে কী-কী অনুমান খাড়া করেছেন, আদৌ করেছেন কী?...

"স্যার, রিপোর্টে লিখে রেখেছি। কাইন্ডলি যদি একটু পড়েন–"

"রিপোর্টার যখন সামনে–"

"তাহলে আমিই বলছি। তবে একটু গল্প করে বলব।"

এই বলে একটা কথার ছবি উপহার দিল ভয়ঙ্কর পাত্র। অনুমানভিত্তিক ছবি। স্রেফ থিওরি।

হ্যান্ডব্যাগ আর স্কার্ফ উধাও হয়ে যেতে পারে যেভাবে, তার মনগড়া কাহিনী...

[৩] একটি থিওরিভিত্তিক কাহিনী

কুন্তলা শীল হাওয়া গাড়িতে চেপে বেরিয়েছে রাত ন'টা নাগাদ। রাস্তায় এখন গাড়িঘোড়া কম। লোকজনও কম। শীতের রাত। হিমেল হাওয়া। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। রেনকোটটা তাই গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল বস-এর সদর দরজা থেকে পার্কিং-স্পেসে রাখা ফিয়াট-এর কাছে যাওয়ার জন্যে। আর খোলেনি, ঝড়ের বেগে উড়ে যাবে স্বগৃহে। গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাবে। এই শীতে ভিজতে ইচ্ছে করে না।

জনহীন রাস্তা কিন্তু পুরো জনহীন নয়। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। স্ট্রিটল্যাম্পগুলো তাদের ডিউটি করে যাচ্ছে। একটা বাতিস্তম্ভের তলায় দাঁড়িয়ে এক পুরুষ মূর্তি। আগুয়ান ফিয়াটকে দেখেই নেমে এল রাস্তায়। গায়ে বর্ষাতি। মাথায় ক্যাপ। হাত তুলে ফিয়াটকে রুখতে চাইছে।

হেডলাইট তো জ্বলছিলই। এবার ফগ-লাইট জ্বেলে দিল কুন্তলা। জনহীন রাতে কেউ যদি লিফট নিতে চায়, তাকে চলন্ত অবস্থাতেই দেখে নেওয়া সমীচীন। যুবতীদের বহু দিক ভাবতে হয়। চেনা মুখ হলে গাড়ি দাঁড় করাবে। অচেনা মুখ হলে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু লোকটা যেভাবে রাস্তার মাঝে চলে এসেছে, পাশ কাটানোর জায়গা কোথায়? মতলব সুবিধের মনে হচ্ছে না। দরকার হলে ধাক্কাই মারবে কুন্তলা। শক্ত হয়ে ওঠে চোয়ালের রেখা।

ফগ লাইট ঝিরঝিরে বৃষ্টি ভেদ করে আলোক বন্যায় ভাসিয়ে দিল লোকটার মুখ। অবসান ঘটিয়ে দিল কুন্তলার উৎকণ্ঠার।

চেনামুখ। খুবই চেনা মুখ।

ব্রেক কষল কুন্তলা।

বললে–"এত রাতে? কোত্থেকে এলে? কোথায় যাবে?"

"একসঙ্গে তিনটে প্রশ্ন," বললে নির্জন পথের পথচারী–"আগে গাড়িতে উঠি। তারপর বলছি," বলে, ফগ-লাইটের সামনে থেকে সরে গিয়ে কুন্তলার বাঁদিকের দরজা খুলে বসল প্যাসেঞ্জার সিটে–"আসছি এয়ারস্ট্রিপ থেকে। এসেছি কোম্পানির P68C সিক্স সিটার এয়ারক্র্যাফটে। যাব বাড়ি–জগৎপুরে।"

কুন্তলা জানে, ইন্ডিয়ায় এখন প্রায় পাঁচশ ছোট এয়ারস্ট্রিপ আছে। 'গ্রিনটাউন'-এর কাছে একটা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৈরি করেছিল ব্রিটিশরা। এখন বড় বড় কোম্পানিরা তাদের নিজস্ব বিমান নামায়। পথচারী পুরুষ বড় কোম্পানির বড় অফিসার। আর এই সব মহলেই তো সুন্দরী কুন্তলার দহরম মহরম বেশি।

গাড়ি গিয়ারে দিতে যাচ্ছে কুন্তলা, এমন সময়ে পাশের পুরুষ ডান হাত দিয়ে খপ করে চেপে ধরল কুন্তলার বাঁ হাত–"তিষ্ঠ।"

"কেন?"

"কারণ আমি এখন বাড়ি যাব না।"

"এত রাতে আবার কোথায়?"

"রাত এমন কিছু হয়নি। মাত্র ন'টা। তোমার মতো সুন্দরীরা বারটার আগে ফেরে না–বিশেষ করে রোববারে।".

"কী বলতে চাও?"

"তোমার মুখে মদের গন্ধ লেগে রয়েছে, কুন্তলা। ওই জিনিস আমার এখন একটু দরকার। বড় ক্লান্ত।"

"ননসেন্স। বার-য়ে যেতে চাও? এ অঞ্চলে নাইট-বার একটাই আছে। তাও উলটোপথে। আমি যেতে পারব না। হাত ছাড়।"

"এবার যাবে?"

ড্যাশবোর্ডের আলোয় বস্তুটাকে দেখতে পেল কুন্তলা। রিভলভার। লোকটার বাঁ হাতে।

কুন্তলা অবাক হল না। ভয় পেল না। এই পুরুষটি আকাশ পথে হিল্লিদিল্লি করে বেড়ায়। রহস্যজনক ব্যবসায় বিস্তর টাকা কামায়, বিস্তর টাকা ওড়ায়। প্রয়োজনে সুন্দরীদের সঙ্গে রাখে। প্রয়োজনে আরও একটু এগয়। তখন শুধু সুরায় শানায় না। কুন্তলা তার গ্ল্যামার ধার দিয়েছে একে ইতিপূর্বে। তাই কিছু মেয়েলি নিরাপত্তা মজুদ রাখতে হয় হ্যান্ডব্যাগে।

কিন্তু আজ রাতে সে পারবে না। কাল অফিস বস থাকবে না। কাজ অনেক।

কঠিন কন্যা কুন্তলার মুখে কোনও কথা আটকায় না। তাই অবলীলায় বলে দিল–"আমার ঠোঁটে লেগে থাকা মদটুকুতে যদি তোমার ইচ্ছে চলে যায়, তাহলে তাই হোক। কিন্তু অস্ত্রটা নামাও।"

শুরু সেইখানে। শেষ একদম শেষে। নির্জন পথ। ঝুপঝুপে বৃষ্টি। অগত্যা হ্যান্ডব্যাগ খুলতে হয়েছিল কুন্তলাকে–নিরাপত্তার খাতিরে। খুলতে হয়েছিল গলার স্কার্ফও–পেছনের সিটে লোকটাকে পাশে নিয়ে বসে কুন্তলা বলেছিল–"খুশি তো? এবার বাড়ি যাওয়া যাক।"

"কিন্তু নেশা তো মিটল না।"

"পেগ দরকার? এরপরেও?"

"সুরা আর সাকি যে টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। বিশেষ করে যখন সাকির হ্যান্ডব্যাগে টাকার বান্ডিল থাকে।"

"অফিসের টাকা–"

"চলো।" লোকটার বাঁ হাতে ফের দেখা দিয়েছে নিকষ সেই বস্তুটা।

"না।"

"তাহলে ঘুমও।"

স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোয় কুন্তলা দেখতে পেল, বিদ্যুৎ বেগে কালো অস্ত্র আঘাত হানতে যাচ্ছে তার মাথার বাঁ দিকে...

তারপর আর কিছু মনে থাকতে পারে না। দুর্বল হৃদযন্ত্র আর সচল থাকতে চায়নি। কিছুক্ষণ গুঙিয়ে ছিল। তারপর বুকের কল গেল থেমে।

প্রাণহীন দেহটা তুলে স্টিয়ারিং-এর সামনে বসিয়ে দিল পুরুষ। রেনকোট আগেই পরে নিয়েছিল কুন্তলা। খোলা চোখ চেয়ে রইল সামনে।

পেছনের সিটে একটু রক্ত ছিটকেছে। ওটা মোছা দরকার।

রিভলভারেও রক্ত লেগেছে। ওটাও মোছা দরকার। ন্যাকড়া কোথায়?

অত খোঁজবার সময় নেই। নিরালা রাস্তায় যদি টহলদার পুলিস এসে যায়...

কুন্তলার গলার স্কার্ফ খুলে নেওয়া হয়েছিল তখনই। রক্ত মোছার জন্যে। হ্যান্ডব্যাগ হাতানো হয়েছিল চার হাজার টাকা আত্মসাৎ করার জন্যে। আর রক্তমাখা স্কার্ফটা তার ভেতরে রাখবার জন্যে। এলোপাতাড়িভাবে পার্কিং স্পেসে গাড়ি ঢুকিয়েছিল কুন্তলা অশান্ত লোকটিকে শান্ত করার জন্য।

গম্ভীর মুখে সব শুনল জয়ন্ত। মনে মনে বলল–'ভয়ঙ্কর, তুমি একটা রামঘুঘু গল্পবাজ। তবে থিওরিটাকে হাজির করলে বটে অভিনব কায়দায়। এরকম 'রিসারেকশন' শার্লক হোমসও পারবে না।'

ঊর্ধনেত্র হয়ে রইল বেশ কয়েক সেকেন্ড। তারপর বললে—"হ্যান্ডব্যাগটা পাওয়া গেলেই গোল চুকে যেত। গাড়ির আশপাশে ঝোপঝাড় তো খুঁজেছিলেন দেখছি এই স্কেচ ম্যাপে—"

"কয়েক স্কোয়ার মাইল ধরে তল্লাশি চালিয়েছিলাম। কাজ শেষ করে নিজে হেঁটেই চম্পট দিয়েছিল খুনী। হ্যান্ডব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে পকেটে রেখেছিল—রক্তমাখা স্কার্ফ তার মধ্যে ঢুকিয়ে কোথাও না কোথাও নিশ্চয় ফেলে গেছে। ও জিনিস নিয়ে কেউ তো বাড়ি ফেরে না। রাস্তা দিয়েও হাঁটে না—লোকের চোখে যাতে না পড়ে, তাই ফাঁকা জায়গায় নিশ্চয় ফেলেছিল। কিন্তু কোথাও পাইনি।"

"এই স্কেচ ম্যাপটা দেখছি এয়ারস্ট্রিপের স্কেচ। এখানেও খুঁজে পাননি, তাই তো?"

"না।"

"রাত ন'টা নাগাদ কোনও এয়ারক্র্যাফট ল্যান্ড করেছিল?"

"করেছিল। P68C সিক্স-সিটার এয়ারক্র্যাফট।"

সিধে হয়ে বসল জয়ন্ত—"প্যাসেঞ্জার কারা ছিল?"

ছ-ফুট বডির বিলক্ষণ লম্বা শিরদাঁড়াটাকে বেঁকিয়ে নিয়ে গুঁফো বদন বাড়িয়ে ধরে ভয়ঙ্কর পাত্র বললে—"সেটাও একটা মিস্ট্রি, স্যার। অন্য লাইনের। প্লেনে পাইলট ছাড়া কেউ ছিল না।"

"সে কী?"

"এ প্লেনে হেরোইন পাচারের কারবার হয়। অথচ লাইসেন্স নেওয়া আছে সিভিল অ্যাভিয়েশনের ডিরেক্টর জেনারেলের কাছ থেকে। বড় কোম্পানি তলায় তলায় এই কারবার করে। 'ফ্লাইং আওয়ার' বাবদ বিশ-বাইশ হাজার টাকা এইভাবে তুলে নেয়। ওটা অন্য লাইনের তদন্ত। লাইসেন্স ক্যানসেল করিয়ে তবে ছেড়েছি। তবে যারা নীচের মহলের ব্যবসা করে, তারা খুনে গুণ্ডাকেও লুকিয়ে নিয়ে আসতে পারে। ইন্ডিয়ায় সব হয়।"

"তা হয়", থুতনি চুলকে বললে জয়ন্ত।

"আমার থিওরিটা খাড়া করেছিলাম এই কারণেই। কেউ না কেউ সেই রাতে কুন্তলা শীলকে এনজয় করেছিল—মেয়েটার সায় নিয়েই—তারপর টাকার লোভে খুন করে পালিয়েছে। নাইট-বারেও গিয়েছিলাম। মালিক মারা যাওয়ায় সেই রাতে বার ছিল বন্ধ।"

"ফাইল ক্লোজ করে দিলেন তারপর?"

"আজ্ঞে।"

[৪] ময়ূরকণ্ঠী রহস্য

ইন্দ্রনাথ গালে হাত দিয়ে সব শুনে গেল। আমিও শুনলাম। তারপর যা বললাম, তা এই কাহিনীর প্রথম লাইনেই লিখেছি।

তারপরেই ব্রহ্মতালু পর্যন্ত চনমন করে উঠল কাহিনীর শেষ পর্ব শুনে। উপসংহার তো নয়—যেন একটা পরমাণু বোমা।

জয়ন্ত বললে ভয়ঙ্কর পাত্রকে—"এবার ঝেড়ে কাশুন, মশায়। ফাইল ক্লোজ করেছেন আট বছর আগে। ক্লোজড ফাইল এখন ওপেন করতে চাইছেন। আমাকে তলব করেছেন। কেন?"

"ছিঃ, ছিঃ! ও কথা বলবেন না, স্যার। আপনি মার্ডার এক্সপার্ট—"

"মার্ডার করার এক্সপার্ট?"

"মার্ডার কেস এক্সপার্ট।"

সিরিয়াস হয়ে গেল জয়ন্ত। কেন না, ভয়ঙ্কর পাত্রও সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে। হাজার হোক, পোড়খাওয়া পুলিস অফিসার। ভণিতা যখন করে, তখন তার পেছনেও উদ্দেশ্য থাকে। পুলিসকে যতই সঙ সাজানো হোক, সৎ অফিসারদের প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর লক্ষ্যভেদী অর্জুন। অথবা, সাপুড়ে বাহানার বাঁশি বাজিয়ে যায় লক্ষ ঠিক রেখে।

ভয়ঙ্কর পাত্র সেই মেট্যালের মানুষ। ধানাইপানাই করে গেছে জয়ন্তকে মেন্ট্যালি তৈরি করার জন্যে। এখন আসছে মিস্ট্রি-পয়েন্টে।

খুদে বম্বশেলটা ছাড়া হলো এইভাবে—"স্যার, হ্যান্ডব্যাগ আর স্কার্ফ—দুটোই পাওয়া গেছে!"

হালকা গলায় জয়ন্ত শুধু বলেছিল—"পি সি সরকারের ম্যাজিক দেখছি নাকি? টুপির মধ্যে থেকে একটার পর একটা বের করেই চলেছেন।"

ভয়ঙ্কর তলাপাত্র নিরুত্তর রইল। নিজের টেবিলের ড্রয়ার টানল। প্রথমে বের করল ময়ূরকণ্ঠী ব্যাগ। তারপর, ময়ূরকণ্ঠী স্কার্ফ। দু'হাতে বস্তু দুটো

নিয়ে রাখল জয়ন্তর টেবিলে।
ঘর নিস্তব্ধ।
জাঁদরেল জয়ন্ত বললে জাঁদরেল ভয়ঙ্করকে—"নাটকটা ভালই করলেন। ক্লাইম্যাক্স এনে দিলেন।"
"এক-একটা কেস এক-একটা নাটক।"
"তা ঠিক। মেয়েটার নাম হওয়া উচিত ময়ূরকণ্ঠী। আট বছর আগে এই ব্যাগ আর এই স্কার্ফের ঝলক তুলেছিল ময়ূরকণ্ঠী মেয়ে রোববারের ডিনার পার্টিতে। তারপর ময়ূরকণ্ঠীর ময়ূরী প্রাণপাখি উড়ে গেল—সেই সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তার অতি প্রিয় বস্তু। এই দুটি বস্তু।"
বস্তু দুটি না ছুঁয়ে ঈষৎ বিষণ্ণ সুরে বলে গেল জয়ন্ত।
তারপর বললে—"টুপির মধ্যে আর কিছু আছে?"
"আছে," বলে, ড্রয়ার টানল ভয়ঙ্কর। বের করল দ্বিতীয় বিস্ময়। রাখল জয়ন্তর টেবিলে—"ময়ূরকণ্ঠী মেয়ের শর্টহ্যান্ড নোটবুক। এই দেখুন কভার। গোটা গোটা অক্ষরে লিখে রেখেছে নিজের নাম—কুন্তলা শীল।"
নোটবই না ছুঁয়ে শুধু চেয়ে রইল জয়ন্ত। পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর। মাত্র চব্বিশটা বছরের পরমায়ু নিয়ে এসে তরতর করে উঠে এসেছিল অনেকটা। কর্মজীবনে উন্নতি করতে গেলে অনেক দাম দিতে হয়। জয়ন্ত চাকরি করে। জয়ন্ত অনেক পদোন্নতি আদায় করেছে। কিন্তু বিবেককে বিসর্জন দিয়ে দাম দেয়নি কক্ষনও।
এই মেয়েটা কি তা দিয়েছিল?
ভারী গলায় বললে—"শর্টহ্যান্ডে লেখা আমি বুঝি না। ট্রানস্লেট করিয়েছেন?"
"করিয়েছি। শেষের গুলো চিঠির ডিকটেশন। বসের বাড়িতে বসে নিয়েছিল—মৃত্যুর আগে। বিজনেস লেটার্স।"
চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে জিনিস তিনটের দিকে চেয়ে রইল জয়ন্ত। হ্যান্ডব্যাগ, স্কার্ফ আর শর্টহ্যান্ড নোট বুক। হাত দিয়ে ছুঁল না।
তারপর চোখ আটকে রইল হ্যান্ডব্যাগে।
"মিস্টার পাত্র।"
"ইয়েস, স্যার।"
"হ্যান্ডব্যাগে আর কী-কী পেয়েছেন?"
"লিপস্টিক, নেল পালিশ, পাউডার, রুমাল,...আর...
কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। জয়ন্তর চোখ ঘুরে গেল এবার স্কার্ফের ওপর। ভাঁজ করে পলিথিন দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে। স্বচ্ছ আবরণ ফুঁড়ে যেন ময়ূরকণ্ঠী জেল্লা বেরচ্ছে।
"মিস্টার পাত্র।"
"ইয়েস স্যার।"
"স্কার্ফ-এর কন্ডিশন দেখে তো মনে হচ্ছে একদম ফ্রেশ। যেন এই মাত্র দোকান থেকে কিনে নিয়ে এসেছে কুন্তলা শীল।"
"রাইট, স্যার।"
"পলিথিন প্যাক থেকে বের করে কাইন্ডলি দেখাবেন?"
"দেখুন", টেবিলের ওপর লম্বা করে স্কার্ফ বিছিয়ে ধরল ভয়ঙ্কর পাত্র—"দেখছেন? রক্তের দাগ এদিকে নেই। এবার দেখুন উলটো দিক। রক্ত মোছার দাগ নেই।"
"তাহলে আপনার থিওরি ভুল। হত্যাকারী খুন করার পর হাতিয়ার মোছেনি স্কার্ফ দিয়ে।"
"আরও একটা ব্যাপার ক্লিয়ার হয়ে গেল, স্যার। খুন হওয়ার সময়ে স্কার্ফ গলায় দেওয়া ছিল না। থাকলে রক্ত লাগত।"
"কারেক্ট।" বলে, আনমনে সতীর্থর সিদ্ধান্ত আপন মনে আউড়ে গেল জয়ন্ত—"কুন্তলা শীল খুন হচ্ছে। গলায় নেই স্কার্ফ..গলায় নেই স্কার্ফ... স্কার্ফ খুলে রেখেছিল.... এমন এক হত্যাকারীর সামনে যার সান্নিধ্যে স্কার্ফ খুলে রাখা যায়...যখন গলবন্ধনীর আবরণ থেকে গলাকে খুলে রাখার দরকার হয়...যখন..."
সামলে নিল জয়ন্ত।
বললে—"টাকা পেয়েছেন?"
"চার হাজারের বাণ্ডিল পাইনি। খুচরো টাকা পয়সা কিছু রয়েছে—কুন্তলার নিজের।"
এতক্ষণে হ্যান্ডব্যাগে হাত দিল জয়ন্ত। খুলল না। উলটে পালটে দেখল। সেলাইয়ের দাগ বরাবর মাটি লেগে রয়েছে—"পেলেন কোথায়?"
নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল ভয়ঙ্কর পাত্র—"খুন যেখানে হয়েছে কুন্তলা শীল, সে জায়গার ধারে কাছে নয়।"
"তাহলে কোথায়?"
"বস-এর বাড়িতে।"
হ্যান্ডব্যাগের ওপর চোখ রেখেই কথা বলে যাচ্ছিল জয়ন্ত। ময়ূরকণ্ঠী জেল্লা যেন তাকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। শেষ কথাটা কানের মধ্যে দিয়ে ব্রেনে ঢুকে গেল গরম লোহার শিকের মতো।
"বস-এর বাড়িতে!"
"বাড়িটার নাম 'মরকত ভবন'। 'গ্রিনটাউন'-এর বাইরে ছিল আট বছর আগে—এখন নেই। শহর ছড়িয়ে পড়ছে।"
জয়ন্ত বোবা। ভয়ঙ্কর পাত্র ভদ্রলোক সত্যিই ভয়ঙ্কর নাটক সাজিয়েছে। এ লোক পুলিস মহলে নাম করবে।
ভয়ঙ্করের পরবর্তী বম্বশেল এল এই ভাবে :
"সেই বাড়ি এখন নার্সিংহোম হয়ে গেছে।"
জয়ন্ত চেয়ে রয়েছে।
ভয়ঙ্কর বলে যাচ্ছে—"বাড়ির মধ্যে ফাঁকা জমি যেখানে ছিল, সেখানে বাড়ি তৈরির তোড়জোড় চলছে। সব জমিতে যদিও এখনও হাত দেওয়া হয়নি। তিন দিন আগে বাগানের মালী পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা থেকে খান কয়েক চ্যাটাল পাথর খুঁড়ে তুলে নিচ্ছিল। ফুলগাছের লাইন ওইখান দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।"
বলে, থামল ভয়ঙ্কর পাত্র।
"তারপর?" আর চুপ করে থাকতে পারল না জয়ন্ত। সাসপেন্স তৈরি করতে পারে বটে ভয়ঙ্কর।
জবাবটা এল এই ভাবে—"পাথরের তলায় পেল হ্যান্ডব্যাগ আর স্কার্ফ।"

[৫] টনক নড়ল ইন্দ্রনাথের

তদন্তের ঘাত প্রতিঘাত ইন্দ্রনাথকে এমনই নিবিষ্ট করে রেখেছিল যে নস্যি নিতেও ভুলে গেছিল। লক্ষ করছিলাম, চাহনি কিন্তু তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মাথায় রক্ত চড়ছে।
জয়ন্ত নীরব হতেই বের করল নস্যির ডিবে। শুধু ধরে রইল। ডিবের দিকে চেয়ে রইল। তারপর চোখ তুলে বললে—"কেস ইন্টারেস্টিং।"
তারপর নিল নস্যি। সশব্দে।
জয়ন্ত ব্রিফকেস খুলে একটা গোবদা ফাইল নিয়ে রাখল কোলের ওপর। ইন্দ্রনাথ সে দিকে চেয়েও দেখল না।
জয়ন্ত গলা খাঁকারি দিয়ে বললে—"ওহে টিকটিকি, মানে কী, বোঝা গেল?"
"অতিশয় স্পষ্ট," বসন্ত চৌধুরি ঢঙে বললে ইন্দ্রনাথ প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণে অদ্ভুত কারুকাজ দেখিয়ে—"কুন্তলা শীল সেই রবিবারের রাতে 'মরকত ভবন' থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন তার গলায় ছিল না ময়ূরকণ্ঠী স্কার্ফ, হাতে ছিল না ময়ূরকণ্ঠী ব্যাগ।"
"ব্যাগটা হাতে ছিল না, কাঁধে ঝুলছিল", ব্যাখ্যা করে দিল জয়ন্ত—"ভয়ঙ্কর ভূতটাকে এই পয়েন্টে প্রশ্ন করেছিলাম। ব্যাগ হাতে ছিল, না, কাঁধে ছিল? কাঁধে ছিল—দেখেছে তিনজন।"
"সেই তিনজন!" বলেই চুপ করে গেল ইন্দ্রনাথ।
"হ্যাঁ, সেই তিনজন—শুধু তিনজন—যারা দাঁড়িয়ে থেকে বিদায় নিতে দেখেছে কুন্তলা শীলকে।"
"বেশ, বেশ। শুধু তিনজন।"
"ভয়ঙ্কর ভূতকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করলাম আরও একটা প্রশ্ন দিয়ে। কুন্তলা শীল স্কার্ফ গলায় জড়িয়েছিল কিভাবে, প্রত্যেককে আলাদা ভাবে তা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কি? ভয়ঙ্কর বললে—ইয়েস, স্যার। তিনজনকে সেপারেটলি জিজ্ঞেস করেছি—তিনজনেই হুবহু একই বর্ণনা দিয়েছে, কিভাবে স্কার্ফ জড়িয়েছিল কুন্তলা শীল।"
"ব্যাগ হাতে ছিল, না, কাঁধে ছিল—এটাও কি সেপারেটলি জিজ্ঞেস করেছিল?"
"করেছিল। তিনজনেরই স্টেটমেন্ট এক। ব্যাগ ঝুলছিল কাঁধে, স্কার্ফ বাঁধা ছিল বিশেষ কায়দায়। কায়দাটা কীরকম, তাও সেপারেটলি দেখিয়েছে তিনজন।"
"তিনজন!" অস্পষ্ট গলায় বললে ইন্দ্রনাথ।
"হ্যাঁ, তিনজন, প্রতিধ্বনি করে গেল জয়ন্ত।"
"মিথ্যে বলেছিল এই তিনজন।"
"স্টেটমেন্ট লেখা হয়েছে এই মিথ্যের ওপর।"
"দাও সেই স্টেটমেন্ট, "এতক্ষণে হাত বাড়াল ইন্দ্রনাথ। জয়ন্ত যখন ফাইল হাতড়াচ্ছে, আমার দিকে তাকিয়ে বললে—"মৃগাঙ্ক, এই জন্যেই

বলেছিলাম, এই পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। ক্লোজড ফাইল এখন ওপেন হচ্ছে।"

বোবার শত্রু নেই, তাই চুপ করে রইলাম।

একগোছা স্টেটমেন্ট বাড়িয়ে ধরল জয়ন্ত—"ছ'জনের স্টেটমেন্ট দিলাম। অঞ্জনা আর কুন্তলা ছাড়া যে চার জন ছিল ডিনার পার্টিতে, সেই চার জনের প্লাস বাবা আর মায়ের।"

প্রতিটি লাইন, প্রতিটি শব্দ দেখল ইন্দ্রনাথ। আট বছর আগে দেওয়া স্টেটমেন্ট। এই জবানির ভিত্তিতেই কুন্তলা শীলের হত্যাকারীকে ধরা যায়নি। কেস ধামাচাপা পড়েছে। খুনী বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমি রোমাঞ্চ কাহিনী লিখি। নিজে রোমাঞ্চিত হই না। কিন্তু সেদিন হয়েছিলাম। ঘর যখন নিস্তব্ধ, জয়ন্ত যখন একদৃষ্টে ইন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে আছে, আমি তখন কাঠ হয়ে রয়েছি।

ভাবছি, হত্যাকারী কে?

[৬] হত্যাকারীর সন্ধানে

নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হল।

বললে ইন্দ্রনাথ— "মিস্টার তথাগত ঘোষদস্তিদার। কুন্তলা শীলের বস। থাকতেন 'মরকত ভবন'-এ।"

"হ্যাঁ", জয়ন্তর জবাব।

"এখন থাকেন না। সে বাড়িতে এখন নার্সিং হোম হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কবে?"

"সাত বছর আগে।"

"কেস ক্লোজড হওয়ার এক বছর পরে?"

"হ্যাঁ"

"উনি গেলেন কোথায়?"

"একটা ছোট বাড়িতে।"

"মরকত ভবন'-এ প্রায় একটা প্রাসাদ—তোমার মুখেই শুনলাম একটু আগে।"

"ঠিক তাই।"

"প্রাসাদে থাকতে গেলে রাজার মতোই থাকতে হয়। তথাগত ঘোষদস্তিদার সেই ভাবেই ছিলেন নিশ্চয়?"

"ভয়ঙ্কর পাত্র সেই রকমই দেখেছিল।"

"প্রাসাদ ছেড়ে পর্ণকুটিরে কেন গেলেন? রাজকীয় লাইফ-স্টাইল ত্যাগ করে সাদামাটা লাইফ-স্টাইল কেন বেছে নিলেন? স্বেচ্ছায়, না, চাপে পড়ে?"

"আমার বিশ্বাস, চাপে পড়ে।"

"অর্থকষ্ট মেটাতে?"

"অবশ্যই।"

"তথাগত ঘোষদস্তিদারের বিজনেস কি টাল খেয়েছিল?"

"না। এখনও রমরমিয়ে চলছে। কিন্তু উনি আর বিজনেসে নেই।"

ভুরু তুলল ইন্দ্রনাথ—"কেন?"

"সেইটা জানবার জন্যেই তোমাকে নিয়ে যাব। ইনটারোগেশনের দোনলা বন্দুক চালাতে হবে।"

"আমি যাব। তার আগে জানতে চাই, বিজনেস যখন রমরমিয়ে চলছে, তখন দেখছে কে?"

"জুনিয়র এক্সিকিউটিভ সুরেশ দে।"

স্টেটমেন্টের গোছার দিকে চোখ নামালো ইন্দ্রনাথ—"সুরেশ দে। মিথ্যে স্টেটমেন্ট যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়।"

"তথাগত ঘোষদস্তিদারের প্রাণের বন্ধুও বটে।"

"তাই জুনিয়র এক্সিকিউটিভকে বিজনেস দেখতে দিয়েছেন পুরোপুরি।"

"ম্যানেজিং এক্সিকিউটিভ বানিয়ে দেওয়ার পর।"

চোখ ছোট হল ইন্দ্রনাথের—"প্রমোশন দিলেন, বিজনেস ছেড়ে দিলেন, প্রাসাদ ছেড়ে ছোট বাড়িতে চলে এলেন। স্ট্রেঞ্জ, নয় কি, জয়ন্ত?"

"নইলে তোমাকে জ্বালাতে আসি? আর একটা ইনফরমেশন বের করেছি ভয়ঙ্করের পেট থেকে। শুনলে থ হবে।"

"যথা?"

"সুরেশ দে বিয়ে করেছে চম্পা সাহাকে।"

[৭] প্রেমের চতুর্ভুজ

সত্যিই থ হয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

বুদ্ধির গগনে যে নাকি নক্ষত্র হয়ে গেছে, আমেরিকার এফ-বি-আই গোয়েন্দাসংস্থা ইন্ডিয়ার সাইবার ক্রাইম সলভ করবার জন্যে যার দ্বারস্থ হচ্ছে,

ইনফোটেক ল'র গলিঘুঁজি দিয়ে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে ভারত সরকার যার বুদ্ধি নিচ্ছে, সেই ইন্দ্রনাথ রুদ্র থ হয়ে গেল জয়ন্তর গ্রেনেড ইনফরমেশনের বিস্ফোরণে।

তারপর খুব আস্তে বললে—"জয়ন্ত, আট বছর আগে ডিনার পার্টির গেস্টদের ডিটেল্‌স্‌ বলবি?"

ইন্দ্রনাথ, আমি, জয়ন্ত—তিনজনেই স্কটিশচার্চ কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। তুই-তোকারির সম্পর্ক ছাড়িয়ে ইদানীং 'তুমি' সম্বোধনে চলে এলেও পুরনো দিনের মতো জম্পেশ আড্ডা যখন শুরু হয়, তখন অজান্তেই মুখ দিয়ে তুই-তোকারি বেরিয়ে আসে। এই নিয়ে আমার গিন্নি কবিতা কম খোঁচা মারেনি। সেদিনের আসরে হাজির থাকলে তিনজনকেই খুঁচিয়ে মারত।

ভাগ্যিস ছিল না। বড় বাগড়া দেয় টান-টান কাহিনীর মধ্যে। বিশেষ করে ইন্দ্রনাথের ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার জন্যে বেচারার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে ছাড়ে। মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায় ইন্দ্রনাথ। থাকুক না। ওর সঙ্গে প্রেম করেও তো বিপদ। পাঁকাল মাছের মতো পিছলে যাবেই। 'মোমের হাত' কেসে প্রেমের অভিনয় করেছিল—কাম ফতে হয়ে যাওয়ার পর কেটে পড়েছিল। 'শার্লক হোমস ক্লাব' কেসে আইভরি লাহা ইন্দ্রনাথকে ধরেও ধরতে পারেনি। বেশি চাপতে গেলে বিপদ আছে। তখন জীবন্ত ব্লেড হয়ে দু'দিকে কেটে বেরিয়ে যাবে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। 'প্রিন্সেস' বলে খেপাত যে মেয়েটিকে, বিড়ালাক্ষি স্বর্ণকেশী অপরূপা সেই সহপাঠিনীর পূর্বপুরুষরা সত্যিই ছিল রাজবংশের মানুষ। ইন্দ্রনাথ তখন তো নমস্য ব্যক্তি হয়নি—থাকত সাধারণ একটা মেসে। প্রিন্সেস-এর বাড়ির লোকেরা মেয়েটাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয় এক রাজপুরুষের সঙ্গে। সেই থেকে ইন্দ্রনাথ ভীষ্ম বনে গেছে। সেই রাজবাড়ির কোনও কেস নেয় না। এমনকি, বালিগঞ্জে মহারাজার প্যালেসের সামনে দিয়েও কখনও যায় না। কিন্তু পাশের একটা চোদ্দতলার মস্ত ফ্ল্যাট কিনে ফাঁকা ফেলে রেখে দিয়েছে—যে ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে বহু নীচে দেখা যায় রাজবাড়ির মস্ত গম্বুজ।

এত কথা আমি ছাড়া কেউ জানে না। কখনও লিখিনি। পুরনো ঘায়ে খোঁচা মারতে চাইনি, বেলেঘাটার বাড়ি তো আমার বউ জোর করে ওকে দিয়ে কিনিয়ে ওকে ওখানে বসিয়েছে। অনেক দূরে জলের ধারে থাকতে চায় থাকুক। কিন্তু ওর অন্তরের অন্তঃস্থলের সেই অতীত বেদনা মাঝে মাঝে আচমকা টলটলিয়ে দেয় ওর হৃদয়াঞ্চলকে, যখনই প্রেমঘটিত ব্যাপারে জটিল কুটিল সর্পিল বঙ্কিম রূপ দেখতে পায়।

সুরেশ দে চম্পা সাহাকে বিয়ে করেছে শুনে তাই নিবাত নিষ্কম্প নিরেট নিটোল ইন্দ্রনাথ রুদ্রও আর বুদ্ধদেবের মতন প্রশান্ত লোচনে থাকতে পারল না। দুই চোখের পাতা অকস্মাৎ পুরো খুলে গেল। পূর্ণ চাহনি স্থির হয়ে রইল পাথর-চোখে।

সুরেশ দে বিয়ে করেছে চম্পা সাহাকে। করতে পারে। করেওছে। একজন পুরুষ বিয়ে যদি করে একজন নারীকে, তাহলে এত উতলা এবং একই সঙ্গে এত অতলা হওয়ার কী আছে?

অতএব, হতবাক হলাম আমিও।

ইন্দ্রনাথের স্থির-লোচন কিন্তু বাঙ্ময় হয়ে উঠল পরক্ষণেই। শব্দের নির্ঝরিণী ঝরাল কণ্ঠ দিয়ে।

"জয়ন্ত, ছ'জনের ডিনার পার্টিতে তথাগত ঘোষদস্তিদার, মানে, বস-আর পার্সোন্যাল সেক্রেটারি, মানে, কুন্তলা শীল-ছাড়া আর যে চারজন হাজির ছিল, তারা ছিল জোড়ায় জোড়ায়। তাই তো?"

"একজন নিয়ে গেছিল তার বাগদত্তাকে, আর একজন নিয়ে গেছিল তার গার্ল ফ্রেন্ডকে। দুই প্লাস দুই-চার।"

"প্রেমের চতুর্ভুজ রচনা করেছিল পার্টিতে যাওয়ার আগে থেকেই। রিপোর্ট তো এই মাত্র পড়লাম। তাতে দেখছি সুরেশ দে'র গার্ল ফ্রেন্ড ছিল অঞ্জনা মল্লিক। চঞ্চল সেনের বাগদত্তা ছিল চম্পা সাহা।"

"এটা একটা ঘটনা।"

"হ্যাঙ ইওর ঘটনা। ঘটনা যদি তাই হয়, তাহলে এ ঘটনা ঘটল কেন? চঞ্চল সেনের বাগদত্তাকে সুরেশ দে বিয়ে করে বসল কেন?"

"হে বন্ধু, তুই বড় উত্তেজিত হচ্ছিস-"

"হবার কারণ আছে বলেই হচ্ছি। একটা মেয়েকে বিয়ে করব বলে নাচিয়ে তাকে বিয়ে না করাটা একটা সোশ্যাল ক্রাইম।"

"মানছি। কিন্তু স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম-"

"ফট ফট করিসনি। এ বিয়েটা কি হৃদয় বিনিময়ের ফলে হয়েছিল?"

"মানে?"

"কোন তিনজন দেখেছিল কুন্তলা শীলকে গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে আর কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে যেতে?"

[৮] সেই তিনজন

"সুরেশ দে, চঞ্চল সেন আর চম্পা সাহা," জয়ন্তর জবাব।

"সুরেশ দে গেছিল কোন মেয়েটার আঁচল ধরে?"

"অঞ্জনা মল্লিকের আঁচল অথবা ওড়না ধরে।"

"চঞ্চল সেন গেছিল কার লগে লগে?"

"চম্পা সাহা তার নাম।"

"গ্লোরিয়াস। চতুর্ভুজের চারকোণে চার মূর্তিমান। সুরেশ-অঞ্জনা, চঞ্চল-চম্পা। ব্রিলিয়ান্ট! ওহে মৃগাঙ্ক, বিয়ের কত বিপদ দেখেছ? লাভ-প্ল্যান ছিল কী? সুরেশ চেয়েছিল অঞ্জনাকে, চঞ্চল চেয়েছিল চম্পাকে। কুন্তলাকে কে চেয়েছিল, সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। কিন্তু কুন্তলা নিজে খতম হয়ে গিয়ে লাভ-প্ল্যান দিল ভেস্তে। লাভ-প্ল্যান হয়ে গেল ব্ল্যাকমেল-প্ল্যান।"

"আই সি। আই সি!"

"সি করেছ অনেক আগেই, মাই ডিয়ার পুলিস বন্ধু। তোমরা ডুবে ডুবে জল খাও। বুলডোজার চালানোর জন্যে দরকার এই পয়মালকে, আই মিন, শ্রীহীন শ্রীযুক্ত ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে তলব করো।"

"ইন্দ্র, তুই মুডে এসে গেছিস।"

"হ্যাঁ, এসে গেছি। কারণ সেই ইটারন্যাল গেম-প্ল্যান এখানেও দেখতে হচ্ছে। প্লেটোনিক লাভ-এর যুগ জাহান্নমে গেছে-এখন শুধু অঙ্ক কষো, আর গাঁট ছড়া বাঁধো। দূর! দূর।"

আমি প্রতিবাদের ঝড় তুললাম- "কবিতা নেই বলে যা-তা বলে যাচ্ছিস। আমাদের বিয়েটা ফাইভ হান্ড্রেড পারসেন্ট প্লেটোনিক লাভ-

"ছিল, এখন নেই", বলেই দুম করে কথা ঘুরিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ-"অঞ্জনা, অঞ্জনা, শুধু এই অঞ্জনা মেয়েটাই এই ব্ল্যাকমেল-প্ল্যানের মধ্যে নেই। তাকে রাখা হয়নি। কারণ, সে দেখেনি কুন্তলা শীলকে বিদায় নিয়ে 'মরকত ভবন' থেকে বেরিয়ে যেতে।"

"তা বটে-"

"তাই সুরেশ দে অবলীলাক্রমে 'ডিচ' করল অঞ্জনা মল্লিককে। গার্লফ্রেন্ড বই তো নয়-ছুঁড়ে ফেলে দিলেই হল। সুরেশের দরকার ছিল ব্ল্যাকমেলিংয়ের জন্যে দল ভারী করার। তাই টান দিল চম্পা সাহাকে। চম্পা সাহা 'ডিচ' করল চঞ্চল সেনকে। মালা দিল সুরেশ দে'র গলায়-"

"তুফান মেল চালাচ্ছিস, ইন্দ্র। একটু দম নে। আমাকে বলতে দে," জয়ন্ত এখন একটা সিক্রেট সেল-এর চিফ-ওকে আর রোখা গেল না- "চঞ্চল সেনও তো দেখেছিল কুন্তলা শীলকে পায়ে পায়ে বিদায় নিতে। চম্পা সাহার সঙ্গে ব্ল্যাকমেলিং জুটি বাঁধলেই তো পারত? তার পক্ষে এই জোট সহজতর ছিল-চম্পা তো তার বাগদত্তা-লিগ্যাল মধুমিলনের জন্যে প্রস্তুত করেই রেখেছিল নিজেকে-"

"ওরে জয়ন্ত দ্য সিক্রেট চিফ, তথাগত ঘোষদস্তিদারের চালু বিজনেসে কোন্ ব্ল্যাকমেলারের ওয়েট বেশি?"

"ইয়ে-সুরেশ দে'র, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ সুরেশ দে'র-"

"যে জানে ব্যবসার নাড়িনক্ষত্র, জানে বস-য়ের কোথায় কোথায় কনট্যাক্ট-কুৎসার মতো মহামারী অস্ত্র প্রয়োগের ষোল আনা সুবিধে তো তারই হাতে-চঞ্চল সেনের হাতে নয়-সে তো অন্য কোম্পানির জুনিয়র এক্সিকিউটিভ। অ্যাম আই ক্লিয়ার, মাই ফ্রেন্ড?"

"চম্পা সাহা একটি ঘুঘু মেয়ে, এই তো? চঞ্চল সেনকে গেঁথে রেখেছিল ফিউচার সিকিউরিটি আর প্রসপারিটির জন্যে। যেই দেখলে, সুরেশ দে'কে বঁড়শিতে গেঁথে রাখলে লাভ বেশি-কারণ সুরেশ বেশি দোহন করতে পারবে তথাগত ঘোষদস্তিদারকে, অমনি বাগদত্তা হওয়ার বাক্য ছাইয়ের গাদায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভিড়ে গেল সুরেশ দে'র সঙ্গে। ন্যাস্টি গেম!"

"মেয়েদের কাছে এসব ব্যাপার ন্যাস্টি নয় মোটেই জয়ন্ত-এই জন্যেই আমার আইবুড়ো মন্দিরের একমাত্র সদস্য অথবা সেবায়েত তুই। যাক বড় বাজে কথা হচ্ছে। বড় উত্তেজিত হয়ে গেছি। মৃগাঙ্ক, মুখখানা অমন প্যাঁচার মতো কথা রাখিসনি-কবিতা বউদি একটা এক্সেপশন। বাঃ, এই তো মুখে হাসি ফুটেছে। জয়ন্ত, সুরেশ দে দোহন চালিয়ে পেয়েছে প্রমোশন প্লাস পুরো বিজনেসের বকলমে মালিকানা-আর একজন ব্ল্যাকমেলারকে জীবন সঙ্গিনী বানিয়ে নিয়ে-আসলে কিসের সঙ্গিনী তা মুখে আটকাচ্ছে বলে বললাম না-কিন্তু থার্ড ব্ল্যাকমেলার, আই মিন, চঞ্চল সেন দ্য এক্সিকিউটিভ অফ অন্য কোম্পানি-দোহন-দৌলত হিসেবে কী পেয়েছে?

"সে আর জুনিয়র এক্সিকিউটিভ নেই। নিজেই একটা অ্যাডভার্টাইজিং ফার্ম খুলে বসেছে বোম্বাইতে-"

"কুন্তলা শীল-এর পরলোক প্রস্থানের নিশ্চয় এক বছর পরে?"

"এগজ্যাক্টলি"

"বিয়ে করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কাকে?"

"অঞ্জনা মল্লিককে নয়। সুরেশ দে'র উচ্ছিষ্টকে নয়।"

"ল্যাংগুয়েজ, ল্যাংগুয়েজ, পুলিসের মুখ মাঝে মাঝে বড় নোংরা হয়ে যায়। তাহলে, সাম অ্যান্ড সাবসট্যান্স দাঁড়াচ্ছে এই: সুরেশ-চঞ্চল-চম্পা....এই তিনজনের অবস্থা ফিরে গেছে কুন্তলা খুন হওয়ার এক বছর পরে?"

"হ্যাঁ।"

"তথাগত ঘোষদস্তিদারের অবস্থা পড়ে গেছে কুন্তলা খুন হওয়ার এক বছর পরে?"

"হ্যাঁ।"

"তথাগত ভদ্রলোক কি বিবাহিত ছিলেন, অথবা, এখন বিয়ে করেছেন?"

"না।"

[৯] জোরার বুলডোজার

নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ। ব্রেনকে একটা ঝাঁকুনি দিল। উচ্চতর চিন্তা শক্তিকে জোরদার করে নিল ব্রেনের পাতলা গ্রে ম্যাটারের স্তরে।

বললে-"পার্টি-ফার্টিতে যাওয়ার সময়ে একটা অলিখিত সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে হয়। জুটি বেঁধে যেতে হয়, কপোত-কপোতীর মতো মঞ্চে উপস্থিত থাকতে হয়। নইলে বেমানান ঠেকে। বিশেষ করে ছোট পার্টিতে। আট বছর আগে ছ'জনের ছোট্ট পার্টিতে এই শোভনতা দেখিয়েছিল সুরেশ আর চঞ্চল। পার্টি-বিহারের জন্যে লালায়িত হয়েছিল অঞ্জনা আর চম্পা। তথাগত ঘোষদস্তিদার কি কুন্তলা শীলকে পার্টি-সঙ্গিনী ধরে নিয়েছিলেন?"

"খবর নিয়ে জেনেছি, তথাগত ঘোষদস্তিদার ছিলেন কুন্তলার ডাবল বয়সী। আটচল্লিশ।"

"তাতে কিসসু এসে যায় না। অকৃতদার তো ছিলেন। যার সাথে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম। তথাগত কি মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন কুন্তলাকে? প্রজাপতির মতোই অ্যাট্রাকটিভ ছিল বলেই তো কুন্তলাকে করা হয়েছিল পার্সোনাল সেক্রেটারি। ডিনারে ডাক দেওয়া কি একটা সিগন্যাল নয়?"

"বাপের বয়সী-"

"ড্যাশ ইট!"

"হ্যাঁ, এরকম সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

"ওই তিনজন কি এই রসের সম্পর্ক জানত?"

"তিনজনেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক তা অস্বীকার করেছে।"

"অর্থাৎ, তথাগতকে আড়াল করে গেছে। রাজার হালে থাকব। অথচ প্রথম রিপুকে দমন করে রাখব-তা কি হয়? হয়, সব ক্ষেত্রে নয়। পনের আনা

ক্ষেত্রে ডুবে ডুবে জল খাওয়া হয়। কন্যারাই খাওয়ায়–মুনিঋষিরা পার পায়নি–তথাগত ছাড়। আগুন আর ঘি পাশে রাখলেই–"

"ইন্দ্রনাথ, তুই কি উঠবি? দেরি হয়ে যাচ্ছে..."

"হ্যাঁ, চল। জেরার বুলডোজার না চালালেই নয়।"

"কিন্তু অঞ্জনা মেয়েটা যে খঞ্জনার মতই উড়ে গেছে।"

"সেই লাভ-লেডি যাকে 'ডিচ' করেছিল সুরেশ দে? নিরুদ্দেশ?"

"হ্যাঁ।"

ভাবিত হল ইন্দ্রনাথ– "মূল সিক্রেট সঙ্গে নিয়েই উড়ে গেল কি?"

"মার্ডার সিক্রেট?"

"কুন্তলা যখন 'মরকত ভবন' থেকে বেরিয়ে গিয়ে মরতে চলেছে, তখন অঞ্জনা কোথায় ছিল?"

একটু চুপ করে থেকে জয়ন্ত বললে– "এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে একজনই– সুরেশ দে, যে 'ডিচ' করেছিল অঞ্জনাকে।"

"কেন করেছিল, সেটাও সুরেশের পেট থেকে নিংড়ে বের করতে হবে। একটা জিনিস তুইও বুঝেছিস, আমিও বুঝে ফেলেছি। এভিডেন্স একদম নেই– স্রেফ কনফেশনের ওপর কেস খাড়া করতে হবে।"

"টাফ জব," শক্ত মুখে বললে জয়ন্ত।

"মহাজোট ভাঙতে হবে, ব্ল্যাকমেলারদের মহাজোট।"

"সেইসঙ্গে মার্ডারারের স্টিল নার্ভ গুঁড়িয়ে দিতে হবে।" "ইন্টারেস্টিং।" বলে, তৃতীয়বার নস্য গ্রহণ সমাপ্ত করল ইন্দ্রনাথ।

[১০] মহাজোট

ডটকম-এর যুগে ইন্ডিয়া অনেক এগিয়ে গেছে। গোটা পৃথিবীটা টেনিস বলের মতো ছোট হয়ে যাচ্ছে– ইন্ডিয়াও তাই। আকাশ পথে ক্যালকাটা থেকে 'গ্রিন টাউন' পৌঁছলাম এই জাতীয় ব্যয়বহুল অগ্রগতির জন্যে। আমি ছিনেজোঁকের মতো পিছনে লেগেছিলাম। এই কেসকে একটা কানাগলি কেস বলা যায়। ব্লাইন্ড লেন কেস। চুটিয়ে তদন্ত হয়েছে। দেওয়ালের সামনে তদন্ত শেষ হয়েছে– দীর্ঘ আট বছর আগে। প্রেতলোকে বসে নিশ্চয় অস্থির হয়ে রয়েছে কুন্তলা শীল। তাই প্রেতকৌশলে মালীকে প্রভাবিত করে বাগানের এমন পাথর তুলিয়েছে, যার নীচে গচ্ছিত রয়েছে তার অতি প্রিয় দুটি বস্তু– স্কার্ফ আর ব্যাগ।

এরকম ব্যাপার ফ্যানট্যাসি গল্প উপন্যাসে মানায়। বাস্তবে যখন ঘটে, তখন আমার মতো গল্পকার উদ্ভট কল্পনায় বুঁদ হয়ে থাকতে ভালবাসে।

কিন্তু ইন্দ্রনাথ আর জয়ন্ত তো অন্য পদার্থ দিয়ে গড়া, আকাশ পথে যেতে যেতে অদ্ভুত আবিষ্কার আর রহস্যাবৃত পঞ্চরথীকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। আমি শুনে গেছি। অঞ্জনা, চম্পা, সুরেশ, চঞ্চল, তথাগত– এই পাঁচজনের 'লাইফ হেল' করে ছাড়তে হবে। মহাজোট ভাঙতে হবে। তবে যদি পাপিষ্ঠ হত্যাকারীকে হাতকড়ি পরানো যায়, সত্য গোপনের চার্জে পঞ্চরথীকেই ফাঁসানো যায়। ওদের 'লাইন অফ অ্যাকশন' আগে থেকেই বলতে চাই না।

'গ্রিনটাউন'-এর পুলিস হোমে আমরা গুছিয়ে বসতে না বসতেই ভয়ঙ্কর পাত্র এল হন্তদন্তিয়ে। সত্যিই একটা নিকষ দৈত্য। এবং, বিকট।

বললে শ্বেত দন্তের শোভা প্রদর্শন করার পর– "স্যার," বলছে জয়ন্তকে– "স্যার, আপনার ইন্সট্রাকশন ক্যারি-আউট করতে পারলাম না।"

"কোন ইন্সট্রাকশনটা?" জয়ন্ত তখন সিক্রেট চিফ-এর পোজ নিয়ে ফেলেছে।

"অঞ্জনা মল্লিক-এর বর্তমান ঠিকানা পেলাম না।"

"আট বছর আগেও তো পাননি– রিপোর্টে দেখিনি।"

"তখন তেমনভাবে খুঁজিনি।"

"মানে?"

"চারজনেই যখন একই স্টেটমেন্ট দিলেন। তখন আর অঞ্জনা মল্লিককে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি।"

"আপনি ছ'টা স্টেটমেন্ট আমাকে পড়িয়েছেন। কুন্তলার বাবার, কুন্তলার মায়ের, সুরেশের, চঞ্চলের, চম্পার আর তথাগতর।"

"আজ্ঞে।"

"অঞ্জনার স্টেটমেন্ট নেননি?"

"তাকে আর পাওয়া যায় নি।"

"একটু আগে বললেন, অঞ্জনা মল্লিককে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাননি।"

"বলেছি।"

"'খুব একটা' শব্দ দুটোর ওপর একটু জোর দিলেন।"

"দিয়েছি।"

"কেন দিলেন?"

"মেয়েটা কলগার্ল ছিল বলে।"

"কলগার্ল!"

"ইয়েস, স্যার। 'গ্রিনটাউন' ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন। এখানে ওই জিনিসের আকছার দরকার হয়। একটা কলগার্ল হোম-ও আছে।"

"অঞ্জনা যে কলগার্ল, তা জানলেন কী করে?"

"সুরেশ দে বলেছেন। ওঁর কাছেই ঠিকানা চেয়েছিলাম। পার্টিতে যাওয়ার জন্যে 'বুক' করেছিলেন অঞ্জনাকে।

"আই সি।... আপনি গেছিলেন কলগার্ল হোমে?..."

"পাইনি অঞ্জনাকে। পাখি উড়ে গেছিল। বাইরের বোর্ডে লেখা আছে 'লেডিজ হোস্টেল'। আসলে... যাকগে। বোর্ডাররা মাঝে মাঝে উড়ে যায়।"

"কোথায় যায় তা নিশ্চয় রেজিস্টারে লিখে যায়?

"লেখা আছে– ক্যালকাটা। আর কিচ্ছু না।"

গুম হয়ে রইল জয়ন্ত। ভয়ঙ্কর দাঁড়িয়েই রয়েছে। আড়চোখে দেখছে ইন্দ্রনাথকে। ওর যা চেহারা, দেখেই মালুম হয় বস্তু কী। আমি একটা নেহাতই ছাপোষা বাঙালি। আমাকে একবারের বেশি দু'বার দেখার দরকার হয় না।

দুম করে বললে ভয়ঙ্কর – "স্যার, ইনিই তো ইন্দ্রনাথ রুদ্র?"

জয়ন্ত মুখ খোলার আগেই হেসে বললে ইন্দ্রনাথ– "হ্যাঁ, আমিই সেই অধম। আর ইনি আমাকে দেখিয়ে– "প্রখ্যাত লেখক মৃগাঙ্ক রায়।– আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। কুন্তলার কেস আপনি ব্রেকথ্রু করেছেন। আপনাকে অভিনন্দন। আট বছর আগে লেখা কেস রিপোর্ট ছবির মতো স্পষ্ট। দেখে শেখা উচিত আজকালকার অফিসারদের। অঞ্জনার স্টেটমেন্ট নেননি, তাকে পাননি বলে। তথাগত কি বলেছেন রিপোর্টে?"

"পড়বেন?" ব্রিফকেস খুলতে গেল ভয়ঙ্কর।

"মুখে বলুন। টাইম ইজ ফাস্ট, লাইফ ইজ শর্ট।"

"সার কথায়, কুন্তলা যখন বিদায় নিচ্ছে, উনি তখন প্রাইভেট চেম্বারে ছিলেন।"

"প্রাইভেট চেম্বারে? অফিস রুম নিশ্চয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। চিঠির ডিকটেশন দিয়েছিলেন ওই ঘরে বসেই। অঞ্জনা তখন ওই ঘরেই ছিল।"

"কুন্তলা চলে যাওয়ার পরেও ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আই সি। তাই কুন্তলাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে শুধু তিনজন– সুরেশ, চঞ্চল আর চম্পা। তাই তিনজনের স্টেটমেন্ট আলাদা ভাবে নিয়ে ভেরিফাই করে আপনি দেখেছেন, একই কথা তিনজনেই বলেছে।"

"ইয়েস, স্যার।"

ইন্দ্রনাথ খুব আস্তে বললে– "অঞ্জনা তখনও প্রাইভেট চেম্বারেই বসে রইল?"

"তিনজনে তাই বলেছে... তথাগতও..."

"শুনেছি। আপনি অঞ্জনার ঠিকানা জোগাড় করলেন পরের দিন? সুরেশের কাছ থেকে?"

"হ্যাঁ। তখন রাত নেমেছে–"

"অঞ্জনাকে খুঁজতে গেলেন কখন?"

"তার পরের দিন সকালে। গিয়ে শুনলাম, তার আগের দিন রাত্রে, মানে, আমি যখন 'মরকত ভবন'-এ রয়েছি, তখন অঞ্জনা মল্লিক 'লেডিজ হোস্টেল' ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।"

চোখের পাতা পড়ল না ইন্দ্রনাথের– "যখন তদন্ত করছিলেন, ঠিক তখন? কটা পর্যন্ত ছিলেন 'মরকত ভবন'-এ?"

"রাত প্রায় নটা পর্যন্ত।"

"অঞ্জনা চলে গেল কটায়? রেজিস্টারে সময় লিখে গেছিল নিশ্চয়। দেখেছেন?..."

"দেখেছি, রাত দশটায়।"

"খটকা লাগেনি?..."

আড়চোখে জয়ন্তকে দেখে নিয়ে ভয়ঙ্কর বললে– "লেগেছিল। মনে হয়েছিল, নিশ্চয় কেউ 'মরকত ভবন," থেকে টেলিফোনে ওয়ার্নিং দিয়েছিল অঞ্জনাকে।"

"কারেক্ট। আপনি তাই অঞ্জনাকে গোরু খোঁজার মতো খুঁজেছিলেন?"

"হদিশ পেলে তো খুঁজব? বিশাল কলকাতায় গেল কোথায়–"
"এসেছিল কোথা থেকে? রেজিস্টারে কী লিখেছিল?"
"কলকাতা থেকে–"
"ব্যস? নো ঠিকানা?"
"নো ঠিকানা।"
"বয়স তখন কত ছিল অঞ্জনার? খোঁজ নিয়েছিলেন নিশ্চয়?"
"নিশ্চয়। চব্বিশ, কুন্তলার সমবয়সী।"
"একটা বিষয় কিন্তু খোঁজ নেননি।..."
সচকিত হলো ভয়ঙ্কর পাত্র। জয়ন্তও।
ইন্দ্রনাথ বললে– "ব্র্যাডশ আছে এখানে?"
"ব্র্যাডশ... রেলের টাইমটেবল... থানায় আছে।"

"দরকার নেই। ওই রয়েছে টেলিফোন। রেল স্টেশনেও আছে টেলিফোন, জিজ্ঞেস করুন, রাত দশটার পর কলকাতার কোনও ট্রেন আছে কিনা। আট বছর আগে ছিল কিনা।"

পাঁচ মিনিট পরে রিসিভার নামিয়ে রেখে শুকনো মুখে লাল চোখ আরও লাল করে তাকিয়ে রইল ভয়ঙ্কর পাত্র।

কণ্ঠে মধু ঝরিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে– "মাথা-গরম করবেন না, কলগার্লের মতো বিত্তহীন কন্যা যদি কলকাতায় যেত রাত দশটার পর, তাহলে নিশ্চয় গাড়ি নিত না... প্লেনেও চাপত না....যদিও অত রাতে প্রাইভেট প্লেনের প্রশ্ন ওঠে না... যেত ট্রেনে... কিন্তু ট্রেন ছিল না রাতে। তাহলে কনক্লুশন কী? অঞ্জনা 'গ্রিনটাউন'-এই ছিল।"

"অন্য কারোর বাড়িতে পালিয়ে লুকিয়েছিল– পুলিসের ভয়ে," "বলল জয়ন্ত– "আপনার মতো করিতকর্মা অফিসার তা আঁচ করলেন না?"

ভয়ঙ্করের ছ-ফুট বপু যেন কুঁচকে গেল এই দাবড়ানিতে।

ইন্দ্রনাথের কণ্ঠে কিন্তু সুধার ক্ষরণ অব্যাহত রইল– "আসলে ওঁর তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তিনজনের হুবহু এক স্টেটমেন্টের জোরে।

স্বাভাবিক... খুবই স্বাভাবিক... তদন্তকে কানাগলিতে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছে ইচ্ছাকৃত একই রকম স্টেটমেন্ট দিয়ে... যাতে অঞ্জনাকে জেরা করার জেদ না চাপে মাথায়... তবুও আপনি রুটিন মাফিক দৌড়েছিলেন... ফরম্যাল তদন্ত পদ্ধতি ফলো করেছিলেন... চারজনেই তা আন্দাজ করেছিল... টেলিফোন করে সরিয়ে নিয়েছিল অঞ্জনাকে–"

জয়ন্ত বলে উঠল– "সরিয়ে নিয়েছিল? ইউ মিন–"

"অঞ্জনা আশ্রয় নিয়েছিল এই চারজনের কারও বাড়িতে।"
"শেলটার দিয়েছিল চারজনের একজন?"
"জি, হ্যাঁ, বন্ধু।"

"কিন্তু স্যার," বলে উঠল ভয়ঙ্কর পাত্র– "সুরেশ, চঞ্চল, চম্পা তিনজনেই থাকত ছোট ছোট ফ্ল্যাটে। তিনটে ফ্ল্যাটেই আচমকা, একই সঙ্গে, লোক পাঠিয়েছিলাম তন্ন তন্ন করে দেখার জন্যে। একই সঙ্গে সার্চ করা হয়েছে 'মরকত ভবন'ও– মার্ডারের অস্ত্রের সন্ধানে– কোনও ক্লু যদি পাওয়া যায়, সেই আশায়–"

"প্রাসাদ বললেও তো চলে 'মরকত ভবন'কে?"
"একটু পরেই দেখবেন–"
"অনেক ঘর?"
"হ্যাঁ।"
"একটা মেয়েকে লুকিয়ে রাখা কি অসম্ভব?"
"মোটেই না, স্যার–"
"স্যার নয়, স্যার নয়–"
"ইয়ে, স্বীকার করছি, এই পয়েন্টটা আমি খেয়াল করিনি–"

"করলেও," এ-কে ফরটি সেভেন চালিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ– "ধরুন, বাড়িটাকে ওয়াচ করাতেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। চিনতেন কী করে অঞ্জনাকে? তাকে তো কেউ দেখেননি? বাড়ির কাজের লোক সাজিয়ে যদি রাখা হত। বাড়ির সবার কানে যদি মন্ত্র বর্ষণ করে তাকে কাজের লোক বলে চালান হত– আপনার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ওয়াচ ভস্মে ঘি ঢালার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।"

মুখ চুন করে চেয়ে রইল ভয়ঙ্কর পাত্র

সুপিরিয়র অফিসারের গাম্ভীর্য বজায় রেখে জয়ন্ত বললে– "মহাজোট! মহাজোট!"

"মিউজিক্যাল চেয়ারের খেলাকেও হার মানিয়ে দেওয়ার মতো। মহাজোট", ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে মিছরির দানা কঠিন মিষ্টি ঝরিয়ে গেল।

[১১] মিউজিক্যাল চেয়ার

এখন ইলেকট্রনিক গেম-এর যুগ এসেছে ডাংগুলি, লাট্টু, মার্বেল গুলি খেলার যুগ চলে গেছে। খেলতে দিলেও ছোঁয় না পাঁচ বছরের বাচ্চারা– কিন্তু কমপিউটার গেমে মাস্টার এক-একজন দেখলে অবাক হতে হয়।

একটু বড় হয়ে আমরা খেলতাম 'মিউজিক্যাল চেয়ার' খেলা, কলের গানের রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে বসতাম গোল হয়ে

একজন একজন করে নেচে নেচে বৃত্ত ছেড়ে বেরিয়ে

যেতাম গানের তালে তালে- শূন্য চেয়ার দখল করতে হত আর একজনকে- নেচে নেচে এসে। শেষ যে থাকত তাকে নিয়ে হত বিস্তর মজা।
এই কেসে সেই মিউজিক্যাল চেয়ার-এর খেলা দেখছি, নেচে নেচে বেরিয়ে গেল চারজন- পঞ্চম জন হাওয়া হয়ে গেল নিমেষে। পুরুষ-বন্ধু পরিত্যক্তা বলে? নাকি, গূঢ়তর কারণে?
জিগ-শ পাজল-এর চাবিকাঠি রয়েছে তার কাছে, কিন্তু সে কোথায়? মর্ত্যলোকে, না, শূন্যলোকে?
তথাগত ঘোষদস্তিদারের বাড়ির দিকে ধাবমান গাড়িতে বসে মিন মিন করে আমার আনাড়িপনা দেখিয়েছিলাম ইন্দ্রনাথের কাছে। অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে থাকা সত্ত্বেও। হীরক-কঠিন চোখে ও শুধু আমার দিকে তাকিয়েছিল। দুই মণি-তে দেখেছিলাম বিপুল শক্তির সঞ্চয়। নিরুত্তর থেকেছে। আমিও চুপ মেরে গেছিলাম।
যদিও এই রাজ্যের প্রশাসনকেন্দ্রের নাম 'রাইটার্স বিল্ডিং', তবুও রাইটারদের কোনও কদর নেই। কবিদের যদিও বা আছে, রাইটারদের কিসসু নেই। কবিদের বলা যায়- সর্বজ্ঞ, ক্রান্তদর্শী, নিপুণ, কুশল, বাগ্মী, চিন্তাশীল, ভাবুক ইত্যাদি। কিন্তু লেখকদের খুব জোর বলা যায় কলমচি অথবা কেরানি। 'রাইটার্স বিল্ডিং'-এর নাম কেন হবে না 'লেখক কুঠি'- এ নিয়ে আন্দোলন করা দরকার। আমার প্রতি ইন্দ্রনাথের সেদিনের সেই অবজ্ঞা-চাহনির ফলেই অপ্রাসঙ্গিক এই বিষয়গুলো মনের মধ্যে ভিড় করে এসেছিল। ভয়ঙ্কর পাত্র নিশ্চয় পুলিসি-টেলিপ্যাথির দৌলতে তা আন্দাজও করেছিল। তাই আচমকা প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কথা বলে গেল কবুতর কণ্ঠে। তথাগত নামধারী একদা বিপুল বিত্তবান পুরুষপ্রবর বর্তমানে যে নিকেতনের অধিকারী, সেটি তিনি খরিদ করেছিলেন পনেরো লাখ টাকায়। এই কল কারখানা আর খনি অঞ্চলে পনেরো লাখ খসিয়ে বাড়ি কিনতে গেলে তবিলের জোর থাকা চাই। কিনেছেন সাত বছর আগে- কুন্তলা-তিরোধানের এক বছর পরে, বাড়িটাকে রাখাও হয়েছে বড়লোকি কায়দায়। ছোট, কিন্তু ছিমছাম। মেনটেন্যান্সের পেছনে বিস্তর খরচ- কিন্তু গায়ে লাগে না তথাগত ঘোষ দস্তিদারের। বাগান, লন -- ঝকঝক করছে প্রতিটা জায়গা। কোথাও আগাছা নেই, শুকনো পাতার স্তূপ নেই। খরচের মা-বাপ নেই। কিন্তু চালিয়ে তো যাচ্ছেন।
"বুঝেছি কী বলতে চান," অনেকক্ষণ চুপচাপ শোনবার পর মিছরিদানা স্বরে বলেছিল ইন্দ্রনাথ- "গত সাত বছর ধরে যারা তথাগত ভদ্রলোকের গলায় গামছা দিয়ে নিংড়ে টাকা নিয়ে চলেছে, তারা তথাগতকে নিঃস্ব করতে পারেনি।"
"যা নিয়েছে, তাও কম নয়, স্যার-"
"স্যার বলবেন না।"
"মুদ্রাদোষ... মুদ্রাদোষ... সুপিরিয়র ট্যালেন্ট দেখলেই স্যার, হুজুর না বলে থাকতে পারি না।"
"কী মুশকিল! আচ্ছা বলুন, যা নিয়েছে, তা কম নয়?"
"কী করে কম হবে বলুন? 'মরকত ভবন' প্রাসাদটা কি কম টাকায় ছেড়েছেন? কিনেছে তো মিশনারিদের একটা অরগ্যানাইজেশন- ফরেন মানি... 'গ্রিনটাউন'-এ অমন বাড়ি আর দু'খানা নেই। তিরিশ বিঘে জমির ওপর বাগান, মাঠ, নকল পাহাড়, প্রাসাদ। ষাট লাখ- সাত বছর আগে ষাট লাখ- নো জোক। ষাট লাখ এ পকেটে ঢুকেছে, পনের লাখ ও পকেট থেকে বেরিয়ে গেছে। পঁয়তাল্লিশ লাখ এখনও হাতে।"
"সুরেশ দে কি এখনও ছোট ফ্ল্যাটে থাকে?" ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন।
"মোটেই না। এখন তার অবস্থান একটা বাংলো প্যাটার্নের দোতলা বাড়িতে। গ্যারেজ, বাগান, মালী- সব আছে। সে বাড়ির দাম তো কম নয়।"
"কেনা, না, ভাড়া?"
"কেনা।"
"কত দামে?"
"আমার ইনফরমারের খবর যদি ঠিক হয়, তাহলে দশ লাখ।"
"কবে?"
"কুন্তলার মৃত্যুর এক বছর পরে।"
"মরকত ভবন' বিক্রির পরেই?"
"ইয়েস স্যার, সুরেশ দে চলে এল ফ্ল্যাট ছেড়ে বড় বাড়িতে, তথাগত ঘোষদস্তিদার চলে গেলেন প্রাসাদ ছেড়ে ছোট বাড়িতে।"
"এই পৃথিবীর সবচাইতে নোংরা ক্রাইম- ব্ল্যাকমেলিং।"
জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে- "করা হচ্ছে পাঁচজনের একজনকে- কিন্তু সত্য গোপন করে গেছে চারজনে- একজন নিরুদ্দেশ। অর্থ অতিশয় স্পষ্ট।
"হ্যাঁ, জলের মতো পরিষ্কার। আমাদের টার্গেট এখন তথাগত ঘোষদস্তিদার। তার আগে একটা কাজ বাকি। জয়ন্ত, কুন্তলা শীলের ডেডবডি যেখানে পাওয়া গেছিল, সেই জায়গাটায় আগে যেতে চাই।"
জয়ন্ত কথা বলার আগেই ড্রাইভারকে হুকুম দিল ভয়ঙ্কর।

জায়গাটা আর নিরালা নেই। আগে ছিল শহর একটু দূরে- খনি অঞ্চলের দিকে যাওয়ার পথে। এখন সেখানে সিক্স-লেন হাইওয়ে তৈরি হয়ে গেছে। ব্রিজের তলা দিয়ে নিরন্তর গাড়ি ছুটছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই ব্রিজের ওপর।
"কোথায় সেই পার্কিং স্পেস?" হেঁট হয়ে বললে ইন্দ্রনাথ।
"হাইওয়ে গিলে নিয়েছে," ভয়ঙ্করের জবাব।
"চারদিকে কোনও ঝোপও তো দেখছি না। ব্যাগ আর স্কার্ফ খুঁজেছিলেন-"
"যেখানে যেখানে -- সব সাফ করে দিয়েছে হাইওয়ে।"
ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল ইন্দ্রনাথ, আমার ক্ষেত্রে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। আট বছর আগে... মাত্র আট বছর আগে... যেখানে মরদেহ রেখে ওপারে চলে গেছিল চব্বিশ বছরের প্রাণবন্ত মেয়েটা- সে জায়গাটাও দেখতে পেলাম না, সময় সব মুছে দেয়।
ইন্দ্রনাথ বললে- "এবার দেখব 'মরকত ভবন'- এখনকার নার্সিং হোম।"

সে এক প্যালেস বটে, নবাবি রুচি থাকলে এমন বাসস্থান বানানো যায়। বাদশাহি বাগিচায় কাজ করছিল একজন মালী।
গাড়ির মধ্যে বসেই ইন্দ্রনাথ বললে- "এই লোকটাই কি পাথর তুলে ব্যাগ আর স্কার্ফ পেয়েছিল?"
"আজ্ঞে হ্যাঁ। ডাকব?"
"এখন থাক। ও তো খুঁড়ে উদ্ধার করেছে- যে মাটি চাপা দিয়েছিল, আগে দরকার তাকে। না, তথাগত ঘোষদস্তিদার পরে... আগে সুরেশ দে।"

স্মার্ট বাড়ি কিনেছে বটে সুরেশ দে। আর বর্ণনায় যেতে চাই না।
ভয়ঙ্কর বাড়িয়ে কিছু বলেনি। দশ লাখ ন্যায্য দাম। স্থপতির বাহাদুরি আছে। যেন রাজপুতানার বুক থেকে এ বাড়ি উড়িয়ে এনে বসানো হচ্ছে এই বন আর খনি অঞ্চলের ফ্যাক্টরি মহলে।
এই দশ লাখ বেরিয়েছে তথাগতর পকেট থেকে! আদায় করেছে সুরেশ দে কোম্পানির সর্বেসর্বা অবস্থায় না পৌঁছেই! কুন্তলা শীল মরে গিয়ে কপাল ফিরিয়ে দিয়েছে সুরেশের অনেক দিক দিয়ে। তথাগতর বিজনেস কবজা করেছে, চঞ্চল সেনের বাগদত্তাকে হরণ করেছে...
চম্পা সাহা। মহাজোটের বড় শরিক এই চম্পা সাহা! অনায়াসেই 'ডিচ' করেছে চঞ্চল সেনকে- কণ্ঠলগ্না হয়েছে সুরেশ দে'র।
দর কষাকষিটা হয়েছিল ভালই!
আমার মতনই ইন্দ্রনাথের মনটা খারাপ হয়ে গেছিল ব্রিজে উঠে জায়গাটা দেখতে না পাওয়ায়- যেখানে ভোর চারটের সময়ে লরি চালক এসে দেখেছিল ছোট্ট ফিয়াট গাড়ির চালকের আসনে দু-চোখ খুলে কৃতান্ত-পুরী দেখছে কুন্তলা শীল।
ওর প্রাণের খবর আমিই শুধু রাখি। মন খারাপ হলে আমার সঙ্গেই কথা বলে। সেদিনও যা বলে গেছিল আমার কানের কাছে, একটু আগেই তা লিখলাম।
তারপরেই খুব আস্তে জিজ্ঞেস করল ভয়ঙ্করকে- "চম্পা সাহা সুরেশ দে-কে ছিনিয়ে নিয়েছিল অঞ্জনা মল্লিকের কাছ থেকে, না, সুরেশ দে চম্পা সাহাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল চঞ্চল সেনের কাছ থেকে- সেটা পরিষ্কার হয়ে যেত যদি পাওয়া যেত অঞ্জনা মল্লিককে।"
"আমাদের ব্যাড লাক, স্যার। তবে, বার্গেনিংটা হয়েছিল ভালই। এ ক্রিমিন্যাল গেম অফ মিউজিক্যাল চেয়ার।"
"আপনি অঞ্জনা মল্লিককে দেখেননি?..."
'নো, স্যার।"
"বাকি দুটো মেয়েকে তো দেখেছিলেন। তিন কন্যের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী কে ছিল?"
"অঞ্জনা মল্লিক, চম্পা সাহা আর কুন্তলা শীল- ইনফরমেশন যা পেয়েছি,

তার জোরে বলা যায়, সব চাইতে গ্ল্যামারাস গার্ল ছিল অঞ্জনা মল্লিক।''
''গ্ল্যামারাস! গুড। তখন তার বয়স চব্বিশ?''
''আজ্ঞে।''
''সুন্দরী কে ছিল? রিয়াল বিউটি?''
''চম্পা সাহা। চেহারায় আর মনের জোরে শক্ত।''
''কুন্তলা শীল এই তিনজনের মধ্যে সবচাইতে কম পয়েন্ট পাচ্ছে বিউটি কনটেস্টে?''
''হ্যাঁ, স্যার! বিউটি কনটেস্ট! বলেছেন ভাল। আট বছর আগে অবশ্য এইভাবে হাটে রূপ দেখানোর রেওয়াজ ছিল না। থাকলে–
''চম্পা সাহা মিস গ্রিনটাউন হতে পারত?''
জবাব না দিয়ে জানলার দিকে আঙুল তুলে বাইরে দেখালো ভয়ঙ্কর।
''চম্পা সাহা, এখন, চম্পা দে।''

[১২] বর্শামুখ তদন্ত

গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে এক পারফেক্ট বিউটি। অপ্সরাদের নাকি বয়স বাড়ে না। এই নারী রত্নকে দেখেও বত্রিশ বছর বয়স বলা যায় না। 'ফটক পেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। হাতের শপিং বাস্কেটে চোখ নামিয়ে দেখছে। নিশ্চয় ভুল করে কিছু বাড়িতে ফেলে এসেছে। হাত ঢুকিয়ে দেখল। পেল না। পরমুহূর্তেই ঘুরে গিয়ে ফের ফটক পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই গাড়ি বারান্দার তলা থেকে হনহনিয়ে এগিয়ে এল এক উত্তমকান্তি ভদ্রলোক। সুগঠন আকৃতি, পরনে সিল্কের পায়জামা আর পাঞ্জাবি, বোতাম নিশ্চয় হীরের। বাড়ির ভেতরে আটপৌরে পোশাক যার এত মূল্যবান, তার পকেটের রেস্ত আন্দাজ করা কঠিন নয়। বলিষ্ঠ তার ব্যক্তিত্বও। প্রতি পদক্ষেপে বিধৃত অহং ভাব। কর্তৃত্ব। আত্মবিশ্বাস।
কানের পাশে আস্তে বললে ভয়ঙ্কর– ''সুরেশ দে।''
চম্পার দিকে হাত বাড়িয়েছে সুরেশ। হাতে খানকয়েক খাম। আনতে ভুলে গেছিল চম্পা। সুরেশ নিজেই বেরিয়ে এসে গছিয়ে দিল চম্পার হাতে, চম্পা রাখল শপিং বাস্কেটে। একটু হাসল। বিউটির বিদ্যুৎ খেলে গেল বাগান-পথে। দীর্ঘ পদক্ষেপে 'এই আমি' ব্যক্তিত্ব ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে। বাগান পথ বুঝি কৃতার্থ হয়ে গেল তার চরণ স্পর্শে।
বাতাসের সুরে বললে ইন্দ্রনাথ– ''এবার তথাগত ঘোষদস্তিদার।''

'মরকত ভবন'-এর তুলনায় এ বাড়িকে একটা কটেজ বললেই চলে। কিন্তু তা কুবের কটেজ।
সদর দরজা খুলে ধরল যে ভদ্রমহিলা তার বয়স তিরিশের নীচে নয়, পঁয়ত্রিশের ওপরে নয়। পরনে পিঙ্ক কালারের টেলর-মেড শালোয়ার কামিজ। শরীরের উচ্চাবচকে আণুবীক্ষণিক অনুপাতে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। হেয়ারকাট আধুনিক। বিউটি সেলুনের ছোঁয়া আছে। চাহনি শক্ত। ভারী চেহারা। কিন্তু নিরেট। মাপজোকে সঠিক। তনু ঘিরে একটা অদৃশ্য আকর্ষণ। চটক আর চমকে পোক্ত। দুই চোখ যেন দুটি বৈদূর্য মণি। ঈষৎ ধূসর।
তথাগত ঘোষদস্তিদারের জীবনে অন্য এক নারী। ভয়ঙ্কর পাত্র-র মুখ দেখেই তা বুঝেছিলাম। পরে ওর মুখেই শুনেছিলাম। জবরদস্ত টাইপের এই নারীকে আট বছর আগে সে দেখেনি।
দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণকায়া মহিলা। পুলিস দেখে ডরায়নি। বরং আরও একটু কড়া হয়েছিল চৌকোনা চোয়াল। একটু স্ফীত হয়েছিল নাকের পাটা। বাঁশির মতো নাক। শাণিত। ঈষৎ বক্র। টিয়াপাখির চঞ্চুর মতো।
রাশভারী গলায় বলেছিল ভয়ঙ্কর পাত্র– ''তথাগত ঘোষদস্তিদার আছেন?''
''আছেন, শঙ্খধ্বনি স্বরে আপ্যায়নের লেশমাত্র নেই।
''দেখা করতে চাই।''
''দাঁড়ান।''
ভদ্রমহিলা বিশালকায়া হলেও আবেদনময়ী। তিরিশোর্ধ্ব বয়েসেও। নিয়মিত প্রসাধন পারিপাট্যের চর্চা আছে। মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি। কিন্তু এই ভদ্রমহিলা তার ব্যতিক্রম। প্রথম রিপুর প্রতি প্রীতি আছে, চোখের ম্যাগনেটে সেই আকর্ষণ।
ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের দিক দিয়েও বটে। ভয়ঙ্কর পাত্র রাবণ রাজার বংশধর বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাকেও কেয়ার করল না ভদ্রমহিলা। চৌকাঠ পেরতে দিল না। সদর দরজা মুখের ওপর বন্ধ করে দিল।
আমরা চার মূর্তিমান বাইরে বোকচন্দরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ভদ্রমহিলা নারী আন্দোলন করে কিনা জানি না, তবে পুরুষ জাতটাকে নীচে রাখতে জানে। ব্যক্তিত্ব আর বরতনুর প্রতিটি পরমাণু দিয়ে। যদিও সীমন্তে নেই সিঁদুর রেখা।
মৃদু স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ– ''জিজ্ঞেস করতে গেল তথাগতকে– পুলিসের সামনাসামনি হবে কিনা।''
জয়ন্ত উৎকট গম্ভীর হয়ে বললে– ''হয়তো কিছু জিনিসপত্র সরিয়ে রাখতেও গেল– হঠাৎ হানা দিয়েছি যে।''
''কিন্তু চমকে তো গেল না।'' ভয়ঙ্করের সুচিন্তিত মন্তব্য।
খুলে গেল সদর দরজা। নিখুঁত অবয়বী কৃষ্ণকায়া ভদ্রমহিলা ফের আবির্ভূত হয়েছে দরজা জুড়ে। শঙ্খকণ্ঠে বললে– ''আসুন।''
বড় কম কথার মানুষ বটে এই মহিলা। কথায় নয়, স্বরে- ওই শঙ্খ সুর দিয়ে পুরুষের শরীরে শিহরণ জাগাতে পারে। কবিতা ক্ষিপ্ত হবে জানি, কিন্তু যা সত্যি তা গোপন করি কী করে?
আমাদের স্বাগতম জানাল বৈদূর্য মণি অক্ষি অধিকারিণী, কিন্তু দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল না। শঙ্খস্বরে কাটাকাটা ভাবে বললে– ''উনি রেস্ট নিচ্ছেন। তবুও দেখা করবেন।''
বলে, থামল। বৈদূর্য চক্ষু পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ করে নিল প্রত্যেকের মুখভাব। কিন্তু আমাদের চৈনিক মুখে কোনও ভাবান্তর দেখতে পেল না।
বললে পরক্ষণেই, শঙ্খস্বরকে এবার নিম্নগ্রামে নামিয়ে– ''ওঁর শরীর খুব ভাল নয়, বেশি সময় নেবেন না। বেশি কথা বলাবেন না।''
গৃহকর্ত্রীরাই এইভাবে নোটিস ঝুলিয়ে দেয় অনাহুতদের নাকের ওপর। আমরা গায়ে মাখলাম না। পুলিস প্রয়োজন হলে ভিজে বেড়াল হতে পারে। আমি তো হবই। কারণ আমার দৌড় কলম পর্যন্ত।

বসবার ঘরে ঢুকে বুঝলাম, অতিশয়োক্তি করেনি বৈদূর্য-নয়না।
হুইল-চেয়ারে বসে রয়েছেন তথাগত ঘোষদস্তিদার, ক্লান্ত চোখে চেয়ে রয়েছেন আমাদের দিকে। লুঙ্গির মতো পরেছেন সাদা ধুতি। গায়ে সেকালের জমিদারদের বোতামবিহীন গরদের পাঞ্জাবি– বুকের বাঁ দিকে ঈষৎ খোলা। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামানো। নিশ্চয় কেউ কামিয়ে দেয়। এই অক্ষম শরীরে শেভিং-এর ঝঞ্ঝাট নিত্য বহন করা সম্ভব নয়। কঙ্কালসার আকৃতি। কলার বোন বেরিয়ে আছে। হনুর নিচে গাল তুবড়ে গেছে। খুব ফর্সা, কিন্তু ফ্যাকাসে। রক্তাভা নেই। মাথার লম্বা লম্বা চুল সাদা। আপাদমস্তক তিনি শুভ্র। যেন একটা শ্বেত জ্যোতির মণ্ডল পরিবৃত। বিষাদের কালিমা শুধু দুই চোখে। সে চোখের জ্যোতি পাটে বসেছে।
সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, যেন একটা প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ দেখছি। আমি লেখক মানুষ। ভ্রান্তিবিলাস আমাকেই মানায়।
আরক্ষা বাহিনীর দুই অফিসার শাল বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থেকে দু-হাত তুলে কাষ্ঠ-নমস্কার করতেই হুইল চেয়ারে আসীন ভগ্নপ্রাসাদ সবিনয়ে তা ফিরিয়ে দিলেন। দেখলাম, তাঁর আঙুল কাঁপছে।
ইন্দ্রনাথ এসব শুষ্ক লৌকিকতার ধার দিয়েও গেল না। সূচ্যগ্র চোখে শুধু চেয়ে রইল শ্বেতমূর্তির দিকে।
আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম।
শ্বেতমূর্তি বললেন– 'আপনারা বসুন।''
আসন গ্রহণ সমাপ্ত হল নীরবে।
তারপর নীরস স্বরে বললে ভয়ঙ্কর পাত্র কালো কামিনীকে দেখিয়ে– ''এঁকে এখন যেতে বলুন।''
তথাগতকে কিছু বলতে হলো না। গোলাপী শালোয়ার কামিজ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।
হুইল চেয়ারের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা অর্ধচন্দ্রাকারে বসলাম। ইন্দ্রনাথের হীরে চোখে এরকম দীপ্তি বহুকাল দেখিনি। যেন হিপনোটিক রশ্মি ঠিকরে যাচ্ছে। চোখই ব্রেনের একমাত্র বেরিয়ে থাকা অংশ। চোখের চেহারা দেখেই অনুমান করা যাচ্ছে দেড় কেজি মগজের লক্ষ কোটি স্নায়ুকোষে কী বিপুল পরিমাণ ইচ্ছাশক্তি সংহত করেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। আসন্ন কথা-যুদ্ধের জন্যে...
আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।
ভয়ঙ্কর বললে– ''আমাকে চিনতে পারছেন?''
আশ্চর্য। গলা একটুও কাঁপল না তথাগত ঘোষ দস্তিদারের– ''আট বছর আগে এসেছিলেন... ইন্সপেক্টর... ইন্সপেক্টর...''
''অভয়ঙ্কর তলাপাত্র।''
''হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্যাড... ভেরি স্যাড... মেয়েটাকে কে যে মেরে গেল–''
''মেরে তো যায়নি। হার্ট অ্যাটাক।''
''মেডিক্যাল রিপোর্ট তাই। কিন্তু আপনাদের সন্দেহ ছিল–''

"মার্ডার!" ভয়ঙ্করের স্বর নিষ্কম্প।
অণুপল নৈঃশব্দ্যের পর সবিনয়ে বললেন তথাগত– "উঠে দাঁড়িয়ে যে আপনাদের সমাদর জানাব, সে ক্ষমতা আমার নেই। এঁদের পরিচয় তো পেলাম না?"
উনি পরিচয় চাইছেন আমার, ইন্দ্রনাথের আর জয়ন্তর। 'মার্ডার' শব্দটা কর্ণগোচর হওয়ামাত্র সতর্ক হয়েছেন।
আমি কিন্তু সন্ত্রস্ত হলাম। পুলিসি তদন্তে আমার আর ইন্দ্রনাথের উপস্থিত থাকবার অধিকার আইনত নেই।
কিন্তু সেদিকেই গেল না ভয়ঙ্কর। বড় চতুর। পুলিস কখনও ধুতি পাঞ্জাবি পরে তদন্ত করতে যায় না, তথাগত সেই পয়েন্টে যেতে চাইছেন। কিন্তু আইনের পাঞ্জা যুদ্ধে গেলই না ভয়ঙ্কর।
বললে– "ওঁরা আমাদের সতীর্থ," বলেই, তথাগতর হৃৎকম্পন ঘটানোর জন্যে দেখাল জয়ন্তকে– "ইনি স্পেশ্যাল সেল-এর চিফ। মার্ডার কেসে এক্সপার্ট। জয়ন্ত চৌধুরী।"
আবার অণুপল নীরবতা। তারপর সতর্ক স্বরে তথাগত বললেন– "আপনারা তাহলে এখনও বিশ্বাস করেন, কুন্তলা শীলকে মার্ডার করা হয়েছিল?"
"করি।"
"আট বছর পরেও?"
"হ্যাঁ।"
প্রশান্ত স্বরে কথা বলে যাচ্ছেন তথাগত। উদ্বেগকে অন্তর্নিহিত রেখেছেন। কঠিন ঠাঁই। এই ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে খেলছেন ভালই।
নিশ্চয় তা বুঝেই ইন্দ্রনাথ ওর শক্ত চাহনিকে হঠাৎ নরম করে আনল। খেলা শুরু হল সমানে সমানে।
বললে অমায়িক গলায়– "আট বছর আগে পুলিসের কাছে এ ব্যাপারে যা-যা বলেছিলেন, তা পড়লাম আপনার স্টেটমেন্টে।"
তথাগত বললেন– "বলেছিলাম, রাত নটা নাগাদ কুন্তলা শীল বিদায় নেয়। তার আগে আমি কয়েকটা চিঠির ডিকটেশন দিয়েছিলাম, তা শর্টহ্যাণ্ডে লিখে নেয়– ডিনারের পর। যাওয়ার সময়ে চার হাজার টাকা নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে কয়েকটা বিল পেমেন্টের জন্যে। টাকা রেখে দেয় হ্যাণ্ডব্যাগে। সুরেশ দে, চঞ্চল সেন আর চম্পা সাহা– তিনজন গেস্ট– তা দেখেছে। হ্যান্ডব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে আর গলায় স্কার্ফ বেঁধে কুন্তলা শীল যখন বেরিয়ে যাচ্ছে– তখনও তাকে ওই অবস্থায় দেখেছে এই তিনজন। ফিয়াট চালিয়ে চলে যেতেও দেখেছে। সেই রাতেই মারা যায় কুন্তলা শীল।"
"সজীব কুন্তলা শীলকে শেষ দেখেছে এই তিনজন?"
"হ্যাঁ।"
"আপনি তখন প্রাইভেট চেম্বারে ছিলেন?"
"হ্যাঁ।"
"অঞ্জনা মল্লিক– আর একজন গেস্ট– কোথায় ছিল?"
"অঞ্জনা মল্লিক," একটু যতি দিলেন তথাগত, খুব সামান্য–"লেডিজ টয়লেটে।"
"কুন্তলা শীল সে রাতে আর ফিরে আসেনি? আপনি সিওর?"
"সিওর।"
"হয়তো আপনি জানেন না–"
"আমার বাড়িতে কুন্তলা শীল ফিরে এলে আমি জানব না, তা কী হয়?"
"কুন্তলা শীল চলে যাওয়ার পর চারজন গেস্ট ছিল আপনার বাড়িতে?"
"হ্যাঁ।"
"কতক্ষণ ছিল?"
"রাত বারটা পর্যন্ত।"
"রাত নটা থেকে রাত বারটার মধ্যে কুন্তলা শীল ফিরে এলে–"
"ওদের চোখে পড়ত।"
"কী করছিল তিনজনে?"
"ব্রিজ খেলছিল।"
"কুন্তলা শীল ফিরে এসে অন্য দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকলে জানবে কী করে?"
"জানলার ধারে বসেছিল। পোর্টিকোর সামনে, গাড়ি ঢুকলে জানতে পারত।"
কাঁচা মিথ্যে বলে যাচ্ছেন তথাগত। চোখের পাতা একটুও কাঁপছে না। মনের ওপর চাপ পড়ছে, অথচ বাইরে প্রকাশ করছেন না। ঋষিকল্প মূর্তি। শক্ত ধাত। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির সেই দৃশ্য জীবনে ভুলব না।
প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিল ইন্দ্রনাথ– "কুন্তলা শীল মারা যাওয়ার পর 'মরকত ভবন' বেচে দিলেন?"
"এক বছর পর।"
"কেন?"
"আমার একার পক্ষে বড্ড বড় বলে। তাছাড়া রিটায়ার করব ঠিক করেছিলাম।"
ইন্দ্রনাথ কথার প্যাঁচে কোণঠাসা করছে বটে তথাগতকে, কিন্তু পদে পদে পিছলে যাচ্ছেন ভদ্রলোক, কথার খোকড়। অল্প কথায় মূল পয়েন্ট ধরে রেখেছেন, বিচ্যুতি ঘটতে দিচ্ছেন না।
মোক্ষম পয়েন্টে চলে এল ইন্দ্রনাথ– "আপনি থিওরেটিক্যালি রিটায়ার করলেন– বিজনেসের ভার তুলে দিলেন সুরেশ দে'র হাতে?"
"হ্যাঁ," শান্ত জবাব তথাগতর।
"পার্টনার ছিলেন বলে?"
"এটা পার্টনারশিপ বিজনেস নয়।"
"আপনিই প্রোপ্রাইটর?"
"হ্যাঁ। এখনও।"
"তাহলে সমস্ত দায়িত্ব সুরেশ দে-কে দিলেন কেন?"
স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন তথাগত। স্বর্গীয় হাসি। যেন করুণার অবতার। পরোপকার পরমধর্ম।
বললেন– "বয়েসের ফারাক থাকলেও সুরেশ আমার বন্ধু, বিশ্বস্ত। জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমার হয়ে বিজনেস ম্যানেজ করতে পারবে কিনা। রাজি হয়েছিল। প্রেমোশন দিয়ে সুপ্রিম অথরিটি দিয়েছিলাম। রেজাল্ট ভালই হয়েছে। আমি খুশি।"
খুশি তো সুরেশ দে নিজেও– মনে মনে বলেছিলাম আমি। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, হিন্দি ছবি যে প্রবাদ নিয়ে ফ্যানট্যাসি বানিয়ে বাজার ধরেছে- এও তো তাই। ছেঁড়া কাঁথা থেকে সোনার খাট। প্রাপ্যের অধিক পাওয়া...
ইন্দ্রনাথ ঠিক এই পয়েন্টেই চেপে ধরল তথাগতকে– "অনেক বেশি পাওয়া হয়ে গেল না? জুনিয়র এক্সিকিউটিভ থেকে এক লাফে বকলমে মালিক?"
স্থির চোখে চেয়ে রইলেন তথাগত।
থেমে রইল না ইন্দ্রনাথ– "সেই সঙ্গে ঘটল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার। চঞ্চল সেনের বাগদত্তাকে বিয়ে করে বসল সুরেশ দে।"
তথাগত নিমীলিত নয়ন।
ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ঈষৎ তীব্র– "নিজের গার্ল ফ্রেণ্ডকে হটিয়ে দিয়ে পরের ভাবী বউকে হরণ। স্ট্রেঞ্জ? নয় কী?"
তথাগত এখন প্রকৃতই তথাগত। বুদ্ধ।
কিন্তু দ্যুতি জাগ্রত হয়েছে ইন্দ্রনাথের হীরে চোখে– "চাঁচাছোলা সিদ্ধান্তটা এই : আপনার বর দুজনেরই উপকার করেছে। চম্পা সাহার আর সুরেশ দে-র।"
নিরীহ চোখে, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে তথাগত বললেন– "ঝেড়ে কাশুন।"
আমার মন বলল, হাতুড়ি মারবার সময় এবার হয়েছে। জেরার বাঘবন্দী আক্রমণ সফল হয়েছে। তথাগতকে ঠেলতে ঠেলতে খাদের কিনারায় নিয়ে এসেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।
বলল নিষ্করুণ স্বরে– "যে তিনজন কুন্তলা শীলকে নটার সময়ে বেরিয়ে যেতে দেখে আপনার গল্পকে সাপোর্ট করেছে, সুরেশ দে আর চম্পা সাহা সেই তিনজনের মধ্যে দুজন।"
তথাগত প্রশান্ত।
ইন্দ্রনাথের কণ্ঠে অশনি-সঙ্কেত– "চারজনের মধ্যে একজন সেই রাতেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।"
কোলের ওপর দু-হাত জড় করে বসেছিলেন তথাগত। দেখলাম, আঙুলের ডগাগুলো থির থির করে কাঁপছে। কাঁপছে মুখের পেশিও। খুব অল্প। এই বয়েসে এতটা প্রকৃতিস্থ থাকা কম ক্ষমতা নয়। কথা যখন বললেন, গলার স্বরে তিলমাত্র কাঁপুনি লক্ষ করলাম না। হিমাদ্রিপ্রতিম এই অটলতা সত্যিই বিস্ময়কর।
বললেন– "আপনি বলতে চাইছেন, আমি যা বলেছি, তা মিথ্যে গল্প। চম্পা সাহা আর সুরেশ দে এই মিথ্যে গল্পকে সমর্থন জানিয়ে উপকৃত হয়েছে– যেভাবেই হোক। কোন ইনফরমেশনের ভিত্তিতে এই ধারণা

আপনাদের মাথায় এল, তা কি জানতে পারি?"
নেহাইয়ে পড়ল হাতুড়ির দ্বিতীয় ঘা – হয়তো নক-আউট ঘা- "কুন্তলা শীল-এর হ্যান্ডব্যাগ আর স্কার্ফ পাওয়া গেছে।"
তথাগতর চোখের পাতা কি ইস্পাত দিয়ে তৈরি? একটুও কাঁপল না কেন?
কাঁপল না তখনও, যখন ব্রিফকেস খুলে ময়ূরকণ্ঠী ব্যাগ আর স্কার্ফ বের করে জয়ন্তর হাতে দিল ভয়ঙ্কর। ব্যাগ খুলে কুন্তলা শীলের শর্টহ্যান্ড নোটবুক বের করল জয়ন্ত- নিথর রইল তথাগতর চোখের পাতা। নোটবই তথাগতর কোলে ফেলে দিল জয়ন্ত- অচঞ্চল রইল চোখের পাতা, স্বাভাবিক কৌতূহলে নোটবই উলটে পালটে দেখে ফিরিয়ে দিলেন জয়ন্তর হাতে। প্রাণহীন একটি মেয়ের কাছ থেকে যে এই বস্তু তিনি নিয়ে এসেছেন, সেরকম কোনও লক্ষণ প্রকাশ করলেন না চোখে মুখে।
এইবার নির্ঘাৎ ফাইন্যাল আর তৃতীয় হাতুড়ি-ঘা মারল ইন্দ্রনাথ- "এগুলো পাওয়া গেছে আপনার বাড়িতে- 'মরকত ভবন'য়ে। লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বাগানের একটা পাথরের তলায়।- বলুন এবার আপনার বক্তব্য।"
বক্তব্য রাখলেন তথাগত ঘোষদস্তিদার- আশ্চর্য দৃঢ়তায়।
"আমার বাড়ির বাগানে পাথরের তলায় কে লুকিয়ে রেখেছিল, তা আমি কী করে জানব?
"যদি বলি, আপনিই লুকিয়ে রেখেছিলেন?" ইন্দ্রনাথের স্বরে রুদ্রবীণার টঙ্কার।
"তাহলে বাড়ি বিক্রির আগে নিশ্চয় সরিয়ে ফেলতাম। এরকম পজিটিভ প্রুফ পাথরের তলায় রেখে বাড়ি বেচতাম না। আগে সরাতাম।"
ইন্দ্রনাথ থমকে গেল। দাবার ঘুঁটি চলছে ভাল।
তথাগত মোলায়েম গলায় বললেন- "সরমাকে ডাকি। একটু চা-কফি হোক।"
বলেই, হুইল-চেয়ারের পাশের টেবিলে রাখা বেল পুশ করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। যেন দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে কান পেতেছিল কালোবরণ কামিনী।
কফির অর্ডার দিলেন তথাগত।
দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই ইন্দ্রনাথ বললে- "আপনার গেরস্থালির সব ভার একেই দিয়েছেন?"
"হ্যাঁ।"
"পুরো নাম কী?"
"সরমা সরকার।"
"অনেক দিন আছে?"
"তা প্রায় বার বছর তো বটেই।"
দরজা খুলে গেল। কফি এল।

[১৩] মিনি ক্যামেরার কেরামতি

যে-টেবিলে পুশ বেল টিপেছেন তথাগত, হাতের কাছেই সেই লাল পাথরের টেবিলে কফি-বিস্কুটের ট্রে যখন নামিয়ে রাখছে সরমা সরকার একটু ঝুঁকে, ইন্দ্রনাথ তখন সিগারেট ধরাচ্ছে পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে। প্রথম টিপুনিতে সাদা কাঠি অগ্নিগ্রহণ করল না। সরমা যখন সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথের দিকে চোখ তুলেছে, দ্বিতীয় টিপুনি দিল ইন্দ্রনাথ। সিগারেট ধরে গেল।
একই সঙ্গে দুটি বিচিত্র বিষয় লক্ষ করে গেলাম আমি।
প্রথম, ইন্দ্রনাথ 'কাঁচি' সিগারেট ভক্ত ছিল এককালে। তারপর 'কাঁচি'র বাজারে আসা বন্ধ হয়ে গেল। ইন্দ্রনাথ তাম্রকূটের রকমারি প্রকরণে নেশা অব্যাহত রেখে দিল। বর্তমানে চলছে নস্যি। সিগারেট নয়।
অথচ, সেদিন ও পকেট থেকে বের করল ক্যানসারের এই অগ্রদূতকে।
দ্বিতীয়, ইন্দ্রনাথ প্রকৃতই সুদর্শন। টানা টানা চোখ, কবি-কবি চেহারা, বলিউড-টলিউড-হলিউড গরম করে দেওয়ার ক্ষমতা ওর চোখে, মুখে, কথায়, চেহারায় আছে। কিন্তু ললনা-মহলকে ও এড়িয়ে চলে। অভিনয় ক্ষমতা আর বাকপটুতা দেখায় গোয়েন্দাগিরির সময়ে- রুপোলি দুনিয়ার বহু তালেবর ব্যক্তি ওকে নোয়াতে পারেনি। লাইনে ঢোকাতে পারেনি।
এহেন ইন্দ্রনাথের পানে বৈদূর্য-নয়না কাজের মেয়ে সরমা সরকারের স্টান চাহনি আমাকে বিস্মিত করেছিল। স্পর্ধা তো কম নয়!
দোষ ইন্দ্রনাথের। ও কেন শরীরী চুম্বক!
আঁখি-শরের পলক-ঝলক তুলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল নারীজাতির শেষোক্ত শ্রেণীর সেই নমুনা- যার চলনে-দুলুনির মধ্যেও বাৎস্যায়ন-চর্চার আভাস।
আমি অবাক গলাতেই বলেছিলাম ইন্দ্রনাথকে- "কাঁচি' ছেড়ে এখন কী?"
"বেনসন হেজেস," লাইটার পকেটে রাখতে যাচ্ছে ইন্দ্রনাথ- হাত বাড়াল জয়ন্ত। দামী সিগারেট দেখে শখ হয়েছে পুলিস প্রবরের। লাইটার আর প্যাকেট ওর হাতে গছিয়ে দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কফির কাপ তুলে নিল ইন্দ্রনাথ।
স্মিত মুখে কফিতে চুমুক দিলেন শ্বেতমূর্তি তথাগত। তিলমাত্র টললেননি। বললেন- "আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে? থাকলে বলুন, ধোঁকা কাটিয়ে দিচ্ছি।"
ইন্দ্রনাথ স্যাকারিন-হাসি হেসে বলে গেল- "এসেছিলাম এক থিওরি নিয়ে। ভেবেছিলাম, কুন্তলা শীল মারা গেছিল 'মরকত ভবনে', মাথায় চোট পাওয়ার পর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে জবাবদিহি দিতে হবে আপনাকে। সুরেশ দে আর চম্পা সাহা এই মৃত্যু-বিবরণ বড় বেশি জেনে ফেলেছিল বলেই আপনি ফাঁপরে পড়েছিলেন। তাদের মুখ বন্ধ রাখার দরকার ছিল। সিক্রেট থাকুক ফ্যামিলির মধ্যে- এই চুক্তি নিয়ে বিয়ে করেছিল সুরেশ আর চম্পা- দুই পার্টনার। সিক্রেট যাতে সিক্রেটই থাকে, তাই কোম্পানির সর্বময় কর্তৃত্ব এদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন আপনি। দিতে গিয়ে টাকায় টান পড়েছিল। বড় বাড়ি বেচে দিয়ে ছোট বাড়ি কিনেছিলেন। কিন্তু থিওরি টর্পেডো করে দিলেন আপনার একটা কথায়। বেচেই যখন দিলেন, পাথরের তলা থেকে হ্যান্ডব্যাগ আর স্কার্ফ তুলে নিয়ে গেলেন না কেন? আচ্ছা, এখন আসি।"
স্বর্গীয় হাসির বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে শুধু চেয়ে রইলেন তথাগত। বেল টিপলেন। সরমা সরকার আমাদের সদর দরজার বাইরে নিয়ে গেল। তখন বৈদূর্যমণি চোখের ওপর ইন্দ্রনাথ তার হীরক-চক্ষু নিবদ্ধ করে রাখল সেকেণ্ড কয়েক। কথা হয়ে গেল চোখে চোখে। টেলিপ্যাথিক মেসেজ।

[১৪] বৈদূর্য মণির রহস্য

গাড়িতে উঠে বসেই ইন্দ্রনাথ বললে- "জয়ন্ত, ফিল্মটার ডেভোলাপিং, প্রিন্টিং, এনলার্জমেন্ট চাই এক ঘন্টার মধ্যে।"
জয়ন্ত সিগারেট লাইটারটা পকেট থেকে বের করে দিল ভয়ঙ্করের হাতে- "চাই এক ঘন্টার মধ্যে।" আর কোনও কথা নয়।
ভয়ঙ্করের লাল চোখে তারিফের লহরী খেলে গেল- "কুইক কুইক শাটার মারলেন, স্যার। ঝটাঝট দুবার! লেটেস্ট মডেল?"
ইন্দ্রনাথ বললে- "হ্যাঁ।"
আমি হতভম্ব হয়ে শুধু দেখে গেলাম লাইটাররূপী মিনি ক্যামেরাকে।
ইচ্ছে করলে পুলিস সব পারে, ভারত সরকার টেররিস্ট দমনের জন্যে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বুদ্ধি ধার করবে ভাবছে। কিন্তু ওরকম রত্ন আছে এ দেশেও। তাই এক ঘন্টা নয়, মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে লাইটাররূপী মিনি ক্যামেরার এইট মিলিমিটার ফিল্মের ডেভলপিং-প্রিন্ট-এনলার্জমেন্ট হয়ে গেল। ভয়ঙ্করই দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে ভেতরে গিয়ে ডার্ক রুমে ঢুকে করিয়ে নিয়ে এল। ফুল সাইজ এনলার্জমেন্ট ড্রায়ারে ফেলে শুকিয়ে খটখটে করে এনেছে।
হাত বটে ইন্দ্রনাথের। এত ক্লোজ রেঞ্জে ভিউ ফাইন্ডারে চোখ না রেখেই শুধু আন্দাজে ফোকাস করেছিল। দুটো ছবিতেই বন্দিনী হয়েছে সরমা সরকার। প্রথম ছবিতে মুখ নামিয়ে রয়েছে- দেখা যাচ্ছে মুখের পার্শ্বরেখা- টিয়াপাখি নাক বেশি স্পষ্ট। দ্বিতীয় ছবিতে সোজা চেয়ে রয়েছে ক্যামেরার দিকে। দৃঢ় চোয়াল এই ছবিতে বেশি স্পষ্ট, স্পষ্টতর চোখের চাহনি। ক্যাটস আই চোখের গহনে মশালের আভাস। এই দাহিকা শক্তির সঞ্চারণ ঘটিয়েই মুনিঋষিদেরও অসংযমী করে তোলে স্বর্গসভার অপ্সরা-রা...
ইন্দ্রনাথ বললে- "এবার..."
জয়ন্ত বললে- "কোথায়?"

গাড়ি এসে থামল সেথায়। দরজার মাথায় বোর্ডে লেখা রয়েছে 'লেডিজ হোস্টেল'।
ভয়ঙ্কর বললে- "স্যার, এই সেই কলগার্ল হাউস। এখান থেকেই রাত দশটায় অঞ্জনা মল্লিক চলে গেছিল কলকাতায়।"
নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ- "অফিস ঘরে চলুন।"

"আপনিই ম্যানেজার?" প্রশ্নটা ইন্দ্রনাথের।
"হ্যাঁ, আমিই ম্যানেজার", জবাবটা দিলেন যে প্রৌঢ় রমণী তাঁর কপালে আধুলি সাইজের লাল টিপ, সীমন্তে রেডরোড মার্কা সিঁদুরের বিজ্ঞাপন,

পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ি– যেন, মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন এখুনি। দোষের মধ্যে প্রৌঢ়ার কণ্ঠস্বর বড় বেশি ধাতব– খনখনে রণরণে। চোখের তারা পান্নার মতো পিচ্ছিল। তবে ভয় তরাসে মোটেই নন। পুলিস দেখে ভিরমি খাওয়ার পাত্রী নন। উলটে একটু তেড়েই উঠলেন– "অনেক মেয়ের মানমর্যাদা দেখতে হয় আমাকে। আপনাদের দেখলে এখুনি শোরগোল উঠবে। হোস্টেলের বদনাম হবে। দয়া করে দরজাটা ভেজিয়ে দিন।"

"আমরা অনেক মেয়েকে তো চাই না," দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জয়ন্তকে বলল ইন্দ্রনাথ– "তুই এখানে পিঠ দিয়ে দাঁড়া।" ভয়ঙ্করকে বললে– "আপনি চিনতে পারছেন এই ভদ্রমহিলাকে?"

ভয়ঙ্কর বললে ভয়ঙ্কর গলায়– "আলবৎ পারছি। আট বছর আগে এঁর সঙ্গেই কথা বলে গেছিলাম।"

"ওরকম রোখা গলায় কথা বললে ঝামেলায় পড়বেন", মিহি গলায় বলে গেল ইন্দ্রনাথ রুদ্র – "এ দেশে বর্তমানে নারী রক্ষার, নারীর শ্লীলতা রক্ষার, নারীর মর্যাদা রক্ষার একঝুড়ি আইন আছে। নারী অপকর্ম করলেও পার পেয়ে যাবে, জামিন-অযোগ্য অপরাধ করলেও জামিন মঞ্জুর হবে, পাপ-পঙ্কে ডুবে থাকলেও ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে থাকবে, এমনকি মার্ডার করলেও খালাস পেয়ে যাবে– অথবা, গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। তাই না, ম্যাডাম?"

প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হল যাঁর দিকে, সেই অচলায়তন ভদ্রমহিলা শুধু একটু নাসিকাকুঞ্চন করলেন– মুখের অনুপাতে নাকটা একটু বড় হওয়ায় আনন-শ্রী খুব একটা খোলতাই হল না।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু মিষ্টি-মিষ্টি গলায় গুঁড়ো লঙ্কা ছড়িয়ে গেল প্রতিটি বচনে– "আট বছর আগে এক সোমবারে রাত দশটায় আপনার এই লেডিজ হোস্টেল থেকে একটি মেয়ে হঠাৎ চলে গেছিল কলকাতায়। মনে পড়ছে?..."

"আমি কি কমপিউটার? অত মনে নেই।"

"মনে করিয়ে দিচ্ছি। একটা পার্টিতে গিয়েছিল আপনার সেই বোর্ডার–"

"কে কোথায় যায়, বলে তো যায় না–"

"তা ঠিক, তা ঠিক, নিত্য নতুন নাগরের সঙ্গে অভিসার থাকলে বলে যাওয়া যায় না, কিন্তু এই মেয়েটি যে পার্টিতে গেছিল, সেই পার্টির একটা মেয়ে-গেস্ট জ্যান্ত বাড়ি ফিরতে পারেনি... মনে পড়ছে?... তার নাম ছিল কুন্তলা... কুন্তলা শীল..."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ গো মশায়। এই ইনি–" ভয়ঙ্করকে দেখিয়ে– "খোঁজ করতে এসেছিলেন... ইয়ে..."

"বলুন...বলুন... আপনার এখান থেকে যে মেয়েটি সেই পার্টিতে গিয়েছিল... বসুন...বসুন... উঠবেন না... এই ছবিটা তো তার। ঠিক বলছি?"

স্থির চোখে সরমা সরকারের দুটো এনলার্জড ফোটোর দিকে তাকিয়ে ম্যানেজারনি বললেন– "একটু ভারী হয়েছে... খুব পাতলা ছিল... বেত পাতার মতো... খুব লম্বা..."

"নামটা মনে পড়ছে? মনে করিয়ে দিচ্ছি... অঞ্জনা মল্লিক।"

"হ্যাঁ...হ্যাঁ।"

"আপনাকে এখন ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে। তাহলেই আমরা বিদেয় হবো। নইলে জানেন তো, পুলিসে ছুঁলে আঠারো ঘা–"

"ভয় দেখাচ্ছেন? কেস করে বত্রিশ ঘা করে ছাড়ব। আমার নাম কাত্যায়নী মণ্ডল।"

একটা ছবি উলটো করে টেবিলে রাখল ইন্দ্রনাথ। মধুক্ষরা কণ্ঠে বললে– "পেছনে শুধু লিখে দিন, 'একে আমি চিনি। এর নাম অঞ্জনা মল্লিক।' সই করে দিন তলায়।– থ্যাংকিউ।"

[১৫] নগরবধূ নিকেতন

তিন ঘণ্টা আগে সুরেশ দে মহাশয়ের টগবগে তেজোদৃপ্ত মূর্তি দর্শন করেছিলাম গাড়ির মধ্যে থেকে। 'সেই আমি' ভাবটা এখন অন্তর্হিত হয়েছে বরতনু থেকে। সর্বময় কর্তৃত্বের অদৃশ্য বিচ্ছুরণও স্তিমিত। দুই চোখের মণিতে চাপা সতর্কতা। দুঁদে ব্যক্তি এই সুরেশ দে। ভাঙবে, তবু মচকাবে না।

আমরা এখন বসে আছি তার লিভিং রুমে। যেন রাজপুত-কক্ষ। দেওয়ালের আলমারি থেকে শুরু করে জানলা-দরজার পর্দা– সর্বত্র রাজস্থানি চারুকলা বিধৃত। একটু উগ্র রঙের সমাবেশ বটে, তবে পুরোপুরি প্রাচ্য রুচি– পাশ্চাত্যের বাষ্প নেই এই ঘরে। নেই কোনও ফার্নিচারে।

মাত্র তিনটে ঘণ্টা। এইটুকু সময়ের মধ্যে যেন বয়স বাড়িয়ে ফেলেছে সুরেশ দে। উদ্বেগের কালিমা আস্তরণ বিছিয়েছে অহঙ্কৃত মুখচ্ছবিতে। নিঃসন্দেহে টেলিফোন এসেছিল তথাগত ঘোষদস্তিদারের কাছ থেকে।

ইন্দ্রনাথের সেদিনের তদন্ত-পদ্ধতি বোমারু বিমানের মতোই পবনবেগে একটার পর একটা টার্গেট টাচ করে যাচ্ছিল। কোথাও কালক্ষেপ করছে না, সাসপেক্টদের দম নিতে সময় দিচ্ছে না। ইন্দ্রনাথের এহেন মূর্তি কখনও দেখিনি। ফাইটার ও চিরকালই, কিন্তু সেদিন যেন মূর্তিমান প্রভঞ্জন হয়ে গিয়েছিল। বিধ্বংসী। বিভীষণ।

কাত্যায়নী মণ্ডলকে দিয়ে অঞ্জনা মল্লিকের ছবি আইডেনটিফাই করে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে এসেছিল গাড়িতে। জয়ন্ত চেপে ধরেছিল– "অঞ্জনাই যে সরমা, জানলি কী করে?"

জবাবটা হেঁয়ালি ছাড়া কিছু নয়– "প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে নগরবধূ নিকেতনের বাসিন্দা যারা একবার হয়, তারা নগরবধূ হয়েই থাকতে চায়। এ বড় পিচ্ছিল পথ। আমি সেই আকাঙ্ক্ষা ওর মধ্যে জাগ্রত করেছি। আমি দুঃখিত। অবশ্য পুরোপুরি নয়। মেয়েরা একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়র কৃপায় বুঝতে পারে কোন পুরুষের নজর তাদের দিকে। আমি আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি সেই চ্যানেলে ছুটিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ একটাই। রাত দশটায় নিরাপদ আলয় ছেড়ে যে নগরবধূ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, সে নিশ্চয় গাঢাকা দিয়েছে এই নগরেরই কোনও এক নিকেতনে। নিরাপদতম জায়গা কোনটা? যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে– সেই জায়গাটা। গেস্ট কি হোস্ট-এর বাড়িতে ঠাঁই নেয়? পুলিসের চোখের সামনেই সে আট বছর থেকেছে বাড়ির কাজের লোক সেজে। বাড়ির কর্ত্রী বনে গেছে গৃহস্বামীকে অণুক্ষণ ব্ল্যাকমেল করে। অর্ধেক বয়সী হয়ে চমৎকার লিভ টুগেদার চালিয়ে গেছে। ছিল বহুজনের নগরবধূ– হয়ে রইল একজনের। আমি একটু ইন্ধন জুগিয়েছিলাম বৈচিত্র্যের ফাতনা পেতে। বঁড়শি গিলেছে।..."

আমি উত্তপ্ত স্বরে বলেছিলাম– "এটা অধর্ম।"

অম্লানবদনে ইন্দ্রনাথ বলেছিল– "কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কি অধর্মের আশ্রয় নেননি? পাণ্ডবরা কুন্তিপুত্র বটে, কিন্তু আদৌ কি পাণ্ডব? উদ্দেশ্য যখন মহৎ তখন ছলাকলার কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে। তৃষ্ণা মিটতে চেয়েছিল নগরবধূ– আমি সেই সুযোগ নিয়েছি–,"

"কুন্তলা শীলের হত্যাকারীর নাম জানবার জন্যে, আস্তে বলেছিল জয়ন্ত– "সে কি এই নগরবধূ?"

"দেখা যাক," ইন্দ্রনাথ গাড়ির মধ্যে আর কথা বলেনি।

বলল বাড়ির মধ্যে। সুরেশ দে-র সামনে।

"টেলিফোন পেয়েছিলেন?"

"কার?"

"তথাগত ঘোষদস্তিদারের।"

ভাল ব্যাটিং করে গেল সুরেশ দে– "সে তো রোজই পাই।"

"কারণ আপনি কোম্পানির মেরুদণ্ড। কুন্তলা শীল মারা যাওয়ার এক বছর পরেই এই বাড়ির মালিক। চম্পা সাহার এনগেজমেন্ট রিং খুলে ফেলে দিয়ে তাকে বধূ বানানো। একই সঙ্গে আইবুড়ো বস-এর পার্মানেন্ট নগরবধূর ব্যবস্থাও করে দিলেন– মহাজোটের বড় শরিক অন্দরের অন্তরালে চলে গেল– কাজের মেয়ে হয়ে।..."

"হোয়াট ননসেন্স–"

"শাট আপ! তথাগতবাবুর বাড়িতে এখনও যান তো... যেতেই হয়... কামধেনু যে... বাঁটে যদ্দিন দুধ আছে, দুয়ে যাবেন... না... না... উঠবেন না... গিন্নি কোথায়?... বলবেন না?... আমিই বলে দিচ্ছি... শপিং করতে গেছেন... তিনি এলেই তাঁকে আলাদা ঘরে জেরা করা হবে... তিনিও তো মহাজোটের শরিক... তথাগতবাবু ওয়ার্নিং দিয়ে দেবেন টেলিফোনে, সেটা আঁচ করেই এসেছি... যা বলছিলাম... প্রায়ই যখন যেতে হয় কামধেনুর কটেজে... তখন এই নারী রত্নটিকে দেখতেই হয়... দেখুন, দেখুন... তাই না?..."

অঞ্জনা মল্লিক ওরফে সরমা সরকারের ফটোগ্রাফ দুটো সুরেশ দে-র চোখের সামনে ধরেছে ইন্দ্রনাথ।

বিপুল ব্যক্তিত্ব একটু চুপসে গেছিল ইন্দ্রনাথের বজ্র-ব্যক্তিত্বের ধাক্কায়। কিন্তু সামলে নিল ছবির দিকে চোখ রেখে– "না চেনার কী আছে।"

"নামটা? নামটা বলুন।"

"সরমা।"

"সরমা সরকার?"

"হ্যাঁ।"

"সত্যি বলছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কঠিন চিজ আপনি। হার্ডকোর ক্রিমিন্যাল। চোখের পাতা এখনও কাঁপেনি। কাঁচা মিথ্যে বলে যাচ্ছেন জিভে তিলমাত্র জড়তা না এনে। গুরুদেব!"

"আপনারা কি অপমান করতে এসেছেন?"

"পুজো করতে এসেছি– আপনার প্রতিভার জন্যে।– এই ব্ল্যাক বিউটির নাম তাহলে সরমা সরকার? পকেটে গীতা আনিনি, আনলে ধরিয়ে দিতাম। গীতা ছুঁয়ে বলতে পারবেন, এর নাম সরমা সরকার?..

এই প্রথম চোখের পাতা পর-পর দু'বার ফেলল সুরেশ দে। বললে একটু ক্ষীণ জোরে– "পারব।"

"তাহলে রৌরব নরকের দরজা খুলে গেল আপনার সামনে," বলতে বলতে একটা ছবি উলটিয়ে পেছন দিকটা দেখালো ইন্দ্রনাথ– "কী লেখা আছে? 'একে আমি চিনি। এর নাম অঞ্জনা মল্লিক'– অঞ্জনা মল্লিক কে, সুরেশবাবু? আট বছর আগে যে কলগার্লকে 'লেডিজ হোস্টেল' থেকে বুক করে নিয়ে গেছিলেন ডিনার পার্টিতে ফ্রেন্ড বানিয়ে, কুন্তলা শীল খুন হয়ে যাওয়ার পরের দিনই যাকে ভ্যানিশ করে দিয়েছিলেন হোস্টেল থেকে রাত দশটায়– এনে ফেলেছিলেন কোথায়? 'মরকত ভবন'য়ে– সেই দিন থেকে বাড়িটার নাম হওয়া উচিত ছিল 'নগরবধূ নিকেতন'– সঁপে দিলেন কল্পতরুর ডালপালায়– যে ডালপালায় আপনারও বিচরণ অব্যাহত রইল– শুধু আকাঙ্ক্ষার আকর্ষণে নয়– আতঙ্কের মুখচাপা দেওয়ার জন্যে... কিসের আতঙ্ক তাও বলতে হবে?... সব ফাঁস করে দেওয়ার আতঙ্ক... ঘুঘু কন্যা অঞ্জনা ওরফে সরমা একই ওড়না দিয়ে আপনাদের সবাইকে বেঁধে রেখে নাচিয়ে যাচ্ছিল– এখনও যাচ্ছে– একজনকে মেরেছে... প্রয়োজনে আপনাদেরও মারবে... কাকে মেরেছে তাও জানেন না? কত আর ন্যাকা সাজবেন, সুরেশবাবু? কুন্তলাকে... কুন্তলাকে... গর্হিত কর্ম করেছিল বলেই অঞ্জনাকে উড়িয়ে দেওয়ার দরকার পড়েছিল... কেন করেছিল?... খারাপ কথাটা আমাকে দিয়েই বলাবেন?... মেডিক্যাল রিপোর্টে ধরা গেছে, ডিনার পার্টি থেকে বেরনোর আগে কুন্তলাকে... আপনারা যখন ডিনার রুমে... কুন্তলা তখন তথাগতবাবুর প্রাইভেট চেম্বারে... অঞ্জনা নাকি লেডিজ টয়লেটে ছিল– তথাগতবাবুকে কি বলে গেছিল অঞ্জনা? কেউ যায়? কোনও মহিলা পুরুষকে বলে 'টয়লেটে যাচ্ছি'? না... মিথ্যে কথা... অঞ্জনাও ছিল প্রাইভেট চেম্বারে... প্রাইভেট পার্টি মানেই একটু ফূর্তিফার্তা– আপনারা তিনজনে– আপনি, চঞ্চল সেন, আর চম্পা সাহা সেই সুযোগ করে দিয়েছিলেন বস-কে হাতে রাখার জন্যে– হেল্পার হিসেবে অঞ্জনা দ্য কলগার্লকে আপনিই পাঠিয়েছিলেন প্রাইভেট চেম্বারে... নারীত্বের চরম অবমাননার পর রাগে ঘেন্নায় তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল কুন্তলা– হয়তো ভয়ও দেখিয়েছিল– তখন

সবলা অঞ্জনা একটু হাতের ডোজ দিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল– শক্ত জিনিসটা হাতে উঠে এসেছিল হাতের কাছে ছিল বলে– খুলিতে আচমকা চোট... তার আগে বর্বরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি– দুর্বল হার্ট আর সইতে পারেনি... উঠে দাঁড়ালেন কেন?"

মুখ লাল হয়ে গেছে সুরেশ দে'র। হবেই তো, কতক্ষণ আর এত অপমান একটা মানুষ সইতে পারে?

ইন্দ্রনাথ কিন্তু তাকে মুখ খুলতেই দিল না– "আপনার গুরুদেব বসের মিথ্যের বহর একটু শুনুন। উনি যখন প্রাইভেট চেম্বারে কুন্তলা শীল-য়ের সঙ্গে, আপনারা নাকি তখন 'ব্রিজ' খেলছিলেন, 'ব্রিজ' খেলা কজনে হয়, সুরেশ দে? চারজনে। তাহলে তো অঞ্জনা মল্লিকেরও 'ব্রিজ -য়ের খেলায় থাকা উচিত। উনি কিন্তু মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন– অঞ্জনা গিয়েছিল লেডিজ টয়লেটে। ড্যাম লায়ার। অঞ্জনা, কুন্তলা, বস– তিনজনেই ছিল প্রাইভেট চেম্বারে। আপনারা তিনজনেই একই সাফাই গেয়েছেন স্টেটমেন্টে- নটা নাগাদ বস-য়ের দেওয়া চার হাজার টাকা ব্যাগে ঢুকিয়ে গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে, ফিয়াট হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেছিল কুন্তলা। মিথ্যে... মিথ্যে... সব মিথ্যে... কুন্তলার ডেডবডি গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ফিয়াটে– অত্যাচারের সময়ে স্কার্ফ খুলে পড়েছিল ঘরে– সেইসঙ্গে ব্যাগ– এই দুটো নিয়ে যাওয়ার কথা মনে ছিল না... সঙ্গে গেছিল আর একটা গাড়ি... কে চালিয়ে নিয়ে গেছিল সেই গাড়িটা, সুরেশবাবু? আপনি, না বস? বলবেন না... বেশ... বেশ, সেই গাড়িতে ফিরে এলেন দুজনে... ফিয়াট রইল পড়ে জগৎপুরে! স্কার্ফ আর ব্যাগ দেখতে পেলেন 'মরকত ভবন'-য়ে ফিরে। আর তো ডেডবডির কাছে যাওয়া যায় না... চম্পট দেওয়াই সঙ্গত। তাই করলেন আপনারা চারজনে... আপনি, চঞ্চল সেন, চম্পা সাহা আর অঞ্জনা মল্লিক। তথাগতবাবু– গভীর রাতে বাগানের পাথর খুঁড়ে চাপা দিলেন দু-দুটো পজিটিভ প্রুফ, ব্যাগ আর স্কার্ফ!"

শুধু কথা দিয়ে তৈরি প্রলয় ঝড়ের প্রতিক্রিয়া তো ঘটবেই। ঘটাতেই চেয়েছিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। সুরেশ দে-র আপাদমস্তক এখন কাঁপছে। বিক্রম উবে গেছে। কাঁপতে কাঁপতেই বললে– "তাই যদি হবে তো ব্যাগ আর স্কার্ফ শুদ্ধ বাড়ি বেচতে যাবেন কেন? সরিয়ে নিলেন না কেন বেচবার আগে?"

মোক্ষম টাইট মেরেছে সুরেশ। টেলিফোনে তথাগত যা শিখিয়ে দিয়েছেন, কথা বলার প্রথম সুযোগেই তা তড়বড়িয়ে বলে গেল।

ইন্দ্রনাথ শুধু একটু দম নিল।

[১৬] নাগর-নাগরীর নাগরদোলা

দরজার কাছে শোনা গেল প্যানিক-ঠাসা নারী কণ্ঠ– "এসব কী?"

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল ইন্দ্রনাথ– "মিসেস চম্পা দে? নমস্কার... নমস্কার... চলুন পাশের ঘরে... কেসটা কী? কুন্তলা শীল... আট বছর আগে যে মেয়েটা জ্যান্ত বাড়ি ফিরতে পারেনি পার্টি থেকে।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় চম্পাকে আড়াল করে পায়ে পায়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল ইন্দ্রনাথ।

ফিরে এল পাঁচ মিনিট পরে। মুখ বিজয়দৃপ্ত। সে তুলনায় চম্পা দে বিবর্ণা।

এক সেকেন্ডও সময় দিল না ইন্দ্রনাথ। ঠুসে ধরল সুরেশকে কথার যুযুৎসু-তে– "আপনার প্রশ্নের জবাবটা দিতে এলাম, সুরেশবাবু। তথাগত ঘোষ দস্তিদার আপনাকে টেলিফোনে জানিয়েছিলেন, ব্যাগ আর স্কার্ফ পাওয়া গেছে। আপনার ওয়াইফ তখন মার্কেটিংয়ে ছিলেন– তাই জানতেন না। আমিই জানিয়ে দিলাম। সেই সঙ্গে জেনে নিলাম, আপনার প্রশ্নের জবাব," ফের একটু দম নিল ইন্দ্রনাথ– "বাড়িটা আপনি বেচেছিলেন। আপনাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে আপনার বস বিদেশ গিয়ে বসেছিলেন। তাই পাথর চাপা ব্যাগ আর স্কার্ফ সরানো যায়নি। আপনি জানতেন না। ক্লিয়ার? মেন কালপ্রিট তাহলে আপনার বস আর আপনার কলগার্ল ফ্রেন্ড। চললাম তাদের কাছে। জয়ন্ত– তুই এখানে থাক, ফোন করতে দিবি না। ফোন এলে ধরবি না। অভয়ঙ্করবাবু, আপনি কাইন্ডলি আসুন। মৃগাঙ্ক–"

আমাকে আর বলতে হলো না। এই খুনেদের ভিড়ে ইন্দ্রনাথের সান্নিধ্যই একমাত্র নিরাপদ।

তখন সবে সন্ধে নেমেছে। তথাগতর কুবের-কটেজ কৃস্ট্যাল-কটেজের মতো আলো বিতরণ করছে। বাগানের রাস্তার দু'পাশে সারবন্দী মর্মর-সুন্দরীদের শরীরে শরীরে হ্যালোজেনের ফোকাস ফেলা হয়েছে। জানলায় জানলায় কাট গ্লাসের ঝিকিমিকি আশ্চর্য এক আলোক-কুহক সৃষ্টি করে চলেছে।

আমরা ঢুকলাম বসবার ঘরে সরমা সরকারকে সঙ্গে নিয়ে। দরজা খুলেছিল সে। বৈদূর্য চোখে সেকেন্ড খানেক চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথের হীরে-চোখের দিকে। এখন তার পরনে টেলর-মেড ঢিলেঢালা মিশকালো নাইটি– নকল হীরে বসানো জায়গায় জায়গায়– হাজার রোশনাই ঝলকিত হচ্ছে এক-একটা নকল হীরে থেকে।

তথাগত বসেছিলেন হুইল-চেয়ারে। শান্ত মুখচ্ছবি। মাথার ওপর জ্বলছে ঝাড়বাতি। যেন সাদা মোমমূর্তি।

প্রথম কথা বলল ইন্দ্রনাথ– "অভয়ঙ্করবাবু, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। মৃগাঙ্ক– এখুনি আসছি।"

বেরিয়ে গেল বৈদূর্য-নয়না আর ভয়ঙ্কর পাত্রকে নিয়ে। তারপর যা ঘটেছিল, তা পরে শুনেছিলাম।

পাশের ঘর।

ভয়ঙ্কর পাত্র দাঁড়িয়ে আছে দানোয় পাওয়া মূর্তির মত, মুখ ভাবলেশহীন। আখাম্বা কালো চেহারার মধ্যে শুধু চোখ দুটোই একটু বেশি লাল হয়েছে।

ইন্দ্রনাথ আর সরমা বসল পাশাপাশি– সোফায়। দুজনে দুজনের চোখের দিকে চেয়ে চকমকির ঝিলিক তুলে গেল সেকেণ্ড কয়েক, তারপর খুব নরম গলায় ইন্দ্রনাথ বললে– "তুমিই অঞ্জনা।"

জবাব নেই। চাহনি নিষ্পলক।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে ফটোগ্রাফ দুটো বের করে দেখাল ইন্দ্রনাথ– "তোমার ছবি?"

জবাব নেই।

একটা ছবি উলটে পেছন দিক দেখালো ইন্দ্রনাথ। মুখে বললে একই কথা– "তুমিই অঞ্জনা।"

ছবির দিকে চেয়ে রইল অঞ্জনা মল্লিক।

ইন্দ্রনাথ বললে– "কাত্যায়নী মণ্ডল যখন আইডেনটিফাই করেছেন, তখন আর অস্বীকার করে লাভ নেই। তলায় লিখে দাও– হ্যাঁ, এই ছবি আমার। আমি অঞ্জনা মল্লিক। আমি সরমা সরকার।"

"কলম দিন," গলা কাঁপল না অঞ্জনার।

ঝট করে ঝুঁকে পড়ে বুক পকেট থেকে ডট পেন টেনে এগিয়ে দিল ভয়ঙ্কর।

ধরে ধরে লিখল অঞ্জনা, হাত কাঁপছে। লেখা শেষ হল। সই-ও হল। অঞ্জনা মল্লিক একটু থমকে রইল। চোখ নামিয়েই রয়েছে। সইয়ের তলায় লিখল– "আমি এক বারবধূ।"

স্নিগ্ধ স্বরে ইন্দ্রনাথ বললে– "নিজে যা করো, কুন্তলাকে ওই পথে নামাতে গেলে কেন?"

ঝট করে মুখ তুলে ইন্দ্রনাথের চোখে চোখ রাখল অঞ্জনা। কিছু বলল না। হিপনোটিক চাহনি মেলে ধরে ইন্দ্র কিন্তু বলে গেল– "রাজি হচ্ছিল না?"

"না," গলা ভেঙে গেছে অঞ্জনার।

"তারপর ভয় দেখিয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"তখন মারলে?"

"হ্যাঁ।"

"কী দিয়ে?"

"ভেনাসের মার্বেল মূর্তি দিয়ে। টেবিলে ছিল।"

ফিরে এল ইন্দ্রনাথ, ভয়ঙ্কর আর অঞ্জনা।

মোমমূর্তি তথাগত একটুও নড়লেন না। শুধু তাকালেন অঞ্জনার দিকে। বাঙ্ময় চাহনি। অঞ্জনা বললে– "আমি সব বলেছি।"

ইন্দ্রনাথ বললে সঙ্গে সঙ্গে– "মরকত ভবন' আপনি বেচেননি, তথাগতবাবু। বেচেছিলেন সুরেশ দে। উনি জানতেন না, কুন্তলা নিধনের পর আপনি ব্যাগ আর স্কার্ফ পাথর চাপা দিয়েছিলেন বাগানে। জানলে সরিয়ে নিতেন।"

জবাব দিলেন না তথাগত ঘোষদস্তিদার। শুধু দাঁতে দাঁত ঘষলেন। কট করে একটা শব্দ হল মুখের মধ্যে। মাথা ঝুলে পড়ল বুকের ওপর। চোখ এখন বন্ধ।

এতক্ষণ নীরব ছিলেন কেন, সে রহস্য প্রাঞ্জল হয়ে গেল।

দাঁতের ফাঁকে রেখেছিলেন পটাসিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুল।

অঙ্কন: ইন্দ্রনীল ঘোষ